সাহিত্য যাত্রা

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮০

প্রকাশক : রমা ভট্টাচার্য
২৬ সেন্ট্রাল রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩২

মুদ্রক : শ্রীশিশিরকুমার সরকার : শ্যামা প্রেস
২০বি, ভুবন সরকার লেন। কলকাতা-৭০০ ০০৭

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অগ্রজপ্রতিমেষু—

ভারতীয় থিয়েটারে গত দশ-বারো বছরে যে বেরটোল্ট্ ব্রেশ্ট্-কে সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তিনি সর্বনীতিবিগর্হিত সুযোগ-সন্ধান ও সুবিধাবাদের প্রবক্তা। তাঁর নাটকের প্রয়োগ প্রায়শই বাবু-বিলাসী প্রমোদসর্বস্ব। থিয়েটারের যে উপকরণগুলি ব্রেশ্ট্ শাণিত করে তুলেছিলেন সমাজরূপান্তরের অস্ত্ররূপে, সেগুলি এখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্পগত দুর্বলতা তথা অপারগতার শৈথিল্যে জীর্ণ। দু'একটি ব্যতিক্রমে মঞ্চ পরিকল্পনা কিংবা সাংগীতিক সম্পদে কিংবা দেশজ রীতির সঙ্গে মেলবন্ধনে উত্তরণ ঘটলেও ব্রেশ্ট্-এর সমাজ-চিন্তার জটিল সমগ্রতা এই থিয়েটারে উন্মোচিত হয়নি বললেই চলে। ব্রেশ্ট্ যে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অন্তর্নিহিত দুর্নীতি প্রকাশ করেন, এই ব্যবস্থায় উচ্ছেদ দাবি করেন, তারই সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুব্যক্ত পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বুর্জোয়া নিয়মনীতি অস্বীকারেও উৎসাহ বোধ করেন। কিন্তু সেই পরিপ্রেক্ষিতকে একটা পরিহাসের স্তরে নামিয়ে এনে যখন নীতিবোধ পরিহার করাকেই একটা নব মূল্যবোধের ভিত্তি হিসেবে স্থাপন করা হয়, তখন ব্রেশ্ট্-কে নিছক সুবিধাবাদের ধর্মসাক্ষী দাঁড় করানো হয়। 'থ্রিপেনি অপেরা' থেকে 'লাইফ অফ গ্যালিলিও' পর্যন্ত নাটক নির্বাচনে, নাটক সম্পাদনায় এবং প্রযোজনায় এই বিপজ্জনক প্রবণতা এতই স্পষ্ট যে তার পাশে ব্যতিক্রমগুলি প্রায় হারিয়েই যায়। অর্থাৎ আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনে অহরহ যে আপসরফায় আমরা নিমজ্জিত তারই সমর্থক করে তুলি আমরা বেরটোল্ট্ ব্রেশ্ট্কে, তাঁকে দিয়ে যেন আমরা বলিয়ে নিতে চাই, 'যেহেতু এই সমাজ-ব্যবস্থাটাই অন্যায়, তোমাদের যাবতীয় নীতিহীন অন্যায় কর্মকাণ্ডই সমর্থনযোগ্য।' অন্যায় সমাজব্যবস্থার চাপে মানবসমাজের নৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ছে দেখে আমাদের আতঙ্কিত হবার কথা, অথচ আমাদের থিয়েটারে তা-ই হয়ে ওঠে আনন্দোল্লাসের উপলক্ষ, নাচে-গানে রঙচঙে হয়ে ওঠে অবক্ষয়ের ভয়াবহ ছবি।

১৯৪৯ সালে ব্রেশ্ট্ যখন গল্প ও কবিতায় এই সংকলনটি প্রকাশ করেন, তখন কি তাঁরও মনে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, তাঁর জটিল, 'আয়রনিক' সমাজ-চিন্তাকে এইভাবে বিকৃত করে তাঁরই বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করতে পারে তাঁর

অসম্ভব? নাকি বুর্জোয়া জগতের প্রয়োজনায় তিনি তখনই দেখতে তা চেয়েছেন এই অমানবিক সরলীকরণ? আর তাই কি তিনি পাঠক-দর্শকদের কাছে ফিরিয়ে আনেন এক বলিষ্ঠ, আপসহীন মানবিকবোধ? ক্যালেনডার-কাহিনীগুলির একটিতেও কেউ নিজেকে আপসের ক্লীবতায় মানায়নি; নিজেদের সততায় শেষ পর্যন্ত ভরসা রাখা সহজ হয় না, তবু সেই সততা থেকে বিচ্যুত হন না ব্রেশ্‌ট্-এর প্রিয় কুশীলবেরা। যুদ্ধক্ষেত্রে পালাতে গিয়ে কাঁটার ঝোপে পায়ে কাঁটা বিঁধে অচল হয়ে পড়ে প্রবল গোলমাল তুলে পারসীক বাহিনীকে বিভ্রান্ত ও ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে সক্রেতিস বীরের সম্মান পেয়ে গিয়েও সেই মিথ্যা সম্মান মেনে নেন না। মেনে নেন না, বরং সমরনায়ক আলকিবিয়াদিসকে সমস্ত ঘটনাটা জানিয়েও দেন; আর কোনো কারণে নয়, কেবলমাত্র স্ত্রী ক্সানথিপি-র কাছে চিরজীবন মিথ্যাবাদী হয়ে থাকতে পারবেন না বলে। ক্যালেনডার-কাহিনীর পাতায় ইতিহাসের যে ছবি উন্মোচিত হয়, তাতে প্রায় সিনেমার মতো ভেসে ওঠে ত্রিশ বছরের যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে যখন নিজের চামড়া বাঁচাবার আত্যন্তিক আগ্রহে সাধারণ মানবিক সম্পর্কগুলি শিথিল হয়ে যায়, তখন আবার সেই সম্পর্কের অম্লান মূল্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে আনা নামে ধনীগৃহের পরিচারিকা মেয়েটি এবং আউগ্‌সবুর্গের জনপ্রিয় বিচারক ইগনাৎস্‌ ডোলিঙার; বেকনের বিজ্ঞানানু-সন্ধিৎসা উত্তরাধিকার হয়ে থাকে তাঁর পরিচারক-সঙ্গী ছেলেটির কাছে, জিওর্দানো ব্রুনো বন্দী দশাতেও ভুলতে পারেন না সেই দর্জিবউটিকে যার স্বামীর তৈরি করে দেওয়া কোটের দাম তিনি বন্দী হবার আগে মিটিয়ে আসতে পারেননি। ইয়োরোপিয় নবজাগৃতির মধ্য থেকে পরিবর্তনের যে চেতনা উৎসারিত হয়েছিল, তা বিজ্ঞান, ধর্ম ও সমাজ, সবস্তরেই ছড়িয়ে পড়ল। জনসাধারণের ব্যাপকতম অংশকে তা স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু ব্রেশ্‌ট্-এর মধ্যযুগ-নবজাগৃতির গল্পগুলিতে জনসাধারণের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে ঐতিহাসিক প্রবণতাগুলির যোগই নবজাগৃতির জীবনধর্মকে অন্য মাত্রা দেয়। পরবর্তীকালের বুর্জোয়া মূল্যবোধ এই জীবনধর্মকে ভেঙেছে, ভাঙতে ভাঙতে তাকে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যে। তাই নবজাগৃতির উদার, বিজ্ঞানধর্মী মানবিকতার পাশাপাশি একাধিক গল্প-কবিতায় আসে ফ্যাশিবাদ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা কখনও ব্যঙ্গের ধারে আহত, কখনও বা তারই মধ্যে অনমনীয় সাহসে জেগে ওঠে মানবধর্মের আত্ম-ঘোষণা, যেমন ছোটদের ক্রুসেডযাত্রার বিবরণে।

একমাত্র সীজার ও তাঁর সেনাবাহিনীর পদ্ধতিতেই ব্রেশ্‌ট্‌-এর বহুস্তরক নাটকগুলির জটিলতার স্বাদ খানিকটা পাওয়া যায়। গল্পরচনার কারিগরিতেও সময়ের পূর্বাপরতা নিয়ে যে খেলা আছে, ঐতিহাসিক পরিবর্তনের নাটকীয় মুহূর্তে সমাজের বহু স্তরে, রোম শহরের একাধিক অঞ্চলে ঘটনা-স্রোতকে বিস্তৃত করে দেওয়ার মধ্যে যে বিস্তারের যুক্তি আছে তা একাধারে নাটকীয় ও আখ্যানধর্মে সমৃদ্ধ। ব্রেশ্‌ট্‌ শেক্‌স্‌পীয়র ও এলিজাবেথিয় যুগের নাট্যকারদের ভক্ত সাধক ছিলেন। শেক্‌স্‌পীয়রের 'জুলিয়াস সীজার' নাটক তাঁর পড়া ছিল। শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের সবচেয়ে উত্তেজনাময় মুহূর্তটি যখন তিনি যেন অনেক দূরে থেকে ঝাপসা দেখা এক অনতিমূল্যবান দৃশ্যে পরিণত করেন, মাত্র দু তিনটি বাক্যের অনুৎসাহে, তখন শেক্‌স্‌পীয়রের রচিত দৃশ্যটি যেমন স্মরণে আসে, তেমনি তার নবমূল্যায়ন—না কি অবমূল্যায়নও—ঘটে যায়।

ক্যালেনডার-কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদ হের কয়নারের বাণীর সংগ্রহ। ডাক্তার বেনইয়ামিন বলেন: 'হের কয়নার নির্বিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি, কিন্তু দয়াবান সমাজসেবীরা যে আদর্শ নির্বিত্ত কল্পনা করেন, তার সঙ্গে তাঁর কোনো মিল নেই। তাঁকে ভিতর থেকে দেখানো হয় না। তিনি আশা করেন, দারিদ্র্য তাঁকে যে দৃষ্টিকোণে জোর করে পৌঁছে দিয়েছে, তারই যুক্তিবাহী বিকাশের মধ্য দিয়ে দুঃখদুর্দশার অবলুপ্তি ঘটানো যাবে।...তাঁর বাণীর প্রথম প্রতিক্রিয়া শিক্ষামূলক, দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া রাজনৈতিক, এবং শেষতম প্রতিক্রিয়া কাব্যগুণাত্মক।' কয়নারের কথায় তাই বারবার থমকে দাঁড়াতে হয়, ভাবতে হয়; তবেই অভিজ্ঞতার সহজাত শিক্ষা থেকে প্রজ্ঞার ভূমিতে উত্তরণের সিঁড়ির সন্ধান পাওয়া যায়। কয়নারের শেষ বাণীর সঙ্গে ব্রেশ্‌ট্‌-এর অত্যন্ত প্রিয় সেই মার্কসীয় উচ্চারণের যোগ সুস্পষ্ট। বহুদিন পরে দেখা হতে জনৈক বন্ধু কয়নারকে বলেন: 'তুমি একটুকু পালটাও নি।' 'ও!' বলে কয়নার বিবর্ণ হয়ে যান। মার্কস বলেছিলেন, অতীতের দার্শনিকেরা কেবল পৃথিবীর ব্যাখ্যাই করেছেন; আমাদের দায় তাকে পালটানো। এবং ব্রেশ্‌ট্‌ জানতেন, এই পালটানো শুরু হয় যখন মানুষ নিজেকে পালটাতে শুরু করে, সমাজকে পালটানোর দায় মনে রেখে। তাই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অশুভ, অস্বাভাবিক মূল্যবোধকে অটল, অগ্রাহ্য আত্মসমর্পণে মেনে নেওয়ার গ্লানি থেকে অন্য বিশ্বাসের শক্তিতে মানুষকে পৌঁছে দেওয়ার দায় ব্রেশ্‌ট্‌ তাঁর দায় বলে মেনে নেন ক্যালেনডার-কাহিনীর সহজ তাৎপর্যময়তায়।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

আউগ্‌সবুর্গ-এর খড়ির চক্র

ত্রিশ বছরের যুদ্ধ চলা কালে ৎসিঙলি নামের এক সুইস্‌ প্রোটেস্টান্ট নাগরিকের লেখ-এর ধারের স্বাধীন নগর-শহর আউগ্‌সবুর্গে একটি বড় ট্যানারী সমেত চামড়ার ব্যবসা ছিল। লোকটি আউগ্‌সবুর্গের একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিল, আর তাদের একটি বাচ্চা ছিল। যখন ক্যাথলিক সৈন্যরা সেই শহরের দিকে এগিয়ে আসছিল তখন তার বন্ধুরা পরামর্শ দিয়েছিল তৎক্ষণাৎ পালিয়ে যেতে, কিন্তু তার পরিবারের জন্যই হোক, কিম্বা তার ট্যানারীর ক্ষতি হবে ভেবেই হোক, সে সময় মত ঠিক করে উঠতে পারেনি এবং সময় থাকতে পালিয়ে যেতে পারেনি।

তাই যখন ক্যাথলিক সৈন্যরা ঝড়ের মত এসে পড়ল, তখনো সে শহরেই ছিল। আর তারপর সন্ধ্যাবেলায় যখন লুঠ-তরাজ শুরু হল তখন সে উঠোনের এক গর্তের মধ্যে, যেখানে রঙ রাখা হত, তার মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। কথা ছিল তার স্ত্রী বাচ্চাটাকে নিয়ে শহরের বাইরে আত্মীয়দের কাছে চলে যাবে। কিন্তু, সেই মহিলা তার জিনিস-পত্র, পোশাক-আশাক, গহনা-গাটি আর বিছানা-পত্র গোছ-গাছ করতে বড্ড বেশী সময় নিয়েছিল। ফলে হঠাৎ দোতলার জানালা দিয়ে দেখতে পেল কাইজারের একদল সৈন্য বাড়ীর ভেতরে ঢুকে পড়েছে। আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে সে তখন সব কিছু ফেলে রেখে পেছন দরজা দিয়ে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

এমনি করে বাচ্চাটা সেই বাড়ীতে রয়ে গেল। মস্ত এক ঘরে সে তার দোলনায় শুয়ে একটা কাঠের বল নিয়ে খেলা করছিল। বলটা ছাদের থেকে একটা সুতোয় ঝোলানো ছিল।

সেই বাড়ীতে একজন মাত্র অল্পবয়সী ঝি তখনো ছিল। সে রান্নাঘরে তামার বাসন-পত্র গোছ-গাছ করছিল এমন সময় গলিতে হট্টগোল শুনতে পেল। ছুটে জানালার সামনে গিয়ে দেখল, গলির ওপাশের বাড়ীর দোতলা থেকে সৈন্যরা লুঠের সব সামগ্রী গলির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলছে। সে তখন ছুটে

বাচ্চার ঘরে গিয়ে দোলনা থেকে বাচ্চাটাকে তুলতে যাবে এমন সময় কাঠের সদর দরজায় জোর ধাক্কা মারার শব্দ শুনতে পেল। তার ভীষণ ভয় হল, সিঁড়ি দিয়ে উঠে পালিয়ে গেল।

বাগান সৈন্যে বাড়ী-ঘর বোঝাই হয়ে গেল। তারা সব ভেঙে চুরে তছনছ করে ফেলল। ওরা জানতো যে ওটা প্রোটেস্টান্ট-এর বাড়ী। সেই তল্লাশি আর ঘর-দোর ওলটপালট করার পরও সেই ঝি আন্না আর বাচ্চাটাও অদ্ভুত ভাবে রেহাই পেয়ে গেল। সৈন্যদল চলে গেলে আন্না যে আলমারিটার মধ্যে লুকিয়ে ছিল, তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে দেখে ঘরে বাচ্চাটার গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি। তাড়াতাড়ি বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে সাবধানে বাইরের উঠানে গেল। ইতিমধ্যে রাত হয়ে গেছে, কিন্তু পাশের একটা জলন্ত বাড়ীর লাল আলো এসে পড়েছে এই উঠানে; সেই আলোয় আন্না দেখতে পেল তার মালিকের বীভৎস মৃতদেহ। সৈন্যরা তাকে গর্ত থেকে বার করে খুন করেছে।

এতক্ষণে আন্নার খেয়াল হল, প্রোটেস্টান্টের বাচ্চাসমেত যদি সে রাস্তায় ধরা পড়ে তাহলে তার কি বিপদ হতে পারে। মন চাইছিল না তবুও সে বাচ্চাটাকে আবার দোলনায় শুইয়ে দিল, তাকে একটু দুধ খেতে দিয়ে দোল দিয়ে দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে, সেই শহরের অন্য পাড়ায় তার এক বোন থাকত, তার বাড়ীর পথে রওনা হল। রাত দশটা নাগাদ, শহরে যখন সৈন্যরা তাদের বিজয় উৎসবে মত্ত, তখন আন্না তার ভগ্নীপতিকে সঙ্গে নিয়ে সেই ভিড় ঠেলে শহরের বাইরে বাচ্চাটির মা ক্লাউ ৎসিঙলির খোঁজে বের হল। ওরা একটা মস্ত বাড়ীর দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ল, অনেকক্ষণ পরে দরজাটা একটুখানি ফাঁক হল। একজন বয়স্ক বেঁটে লোক, ক্লাউ ৎসিঙলির কাকা তার মাথাটা বার করল। আন্না রুদ্ধশ্বাসে বলল, হেয়ার্ ৎসিঙলি মারা গেছে তবে বাচ্চাটার কোনো ক্ষতি হয়নি, সে বাড়ীতেই আছে। বয়স্ক লোকটি মাছের মত ঠাণ্ডা চোখে ওদের দেখে বলল, তার ভাইঝি নাকি ওখানে আর নেই, আর প্রোটেস্টান্ট-এর বাচ্চার ব্যাপারে তার নিজেরও কোনো উৎসাহ নেই। এই কথা বলে লোকটা আবার দরজা বন্ধ করে দিল। ফিরে যাবার সময় আন্নাও ভগ্নীপতি লক্ষ্য করে, একটা জানালার পর্দা নড়ে উঠেছিল এবং সে নিশ্চিত হয় যে ক্লাউ ৎসিঙলি ওই বাড়ীতে ছিল। বোঝা গেল নিজের বাচ্চার নামে ঐ অপবাদে তার কোনো লজ্জা হয়নি।

কিছু সময় আন্না আর তার ভগ্নীপতি চুপচাপ পাশাপাশি হেঁটে চলল।

তারপর আন্না তার ভগ্নীপতিকে জানাল যে সে সেই ট্যানারীতে ফিরে গিয়ে বাচ্চাটাকে নিয়ে আসতে চায়। ভগ্নীপতিটি শান্ত প্রকৃতির ভালমানুষ। ওই কথা শুনে শঙ্কিত হল, চেষ্টা করল আন্নাকে ঐ ভয়ঙ্কর চিন্তা থেকে বিরত করতে। ওসব লোকেদের সাথে কিই বা সম্পর্ক ছিল তার? তারা তো তার সঙ্গে একটু ভাল ব্যবহারও কখনো করেনি।

আন্না চুপ করে সব শুনল, তারপর কথা দিল, অন্যায় কিছু করবে না। তবে তাকে অতি অবশ্য একবার ট্যানারীতে যেতেই হবে। চট্ করে দেখে আসবে বাচ্চাটার কিছু দরকার আছে কিনা। আর সে একা যেতে চাইল।

আন্নার জেদ বজায় রইল। লণ্ডভণ্ড করা বিশাল ঘরের মধ্যিখানে বাচ্চাটা তার দোলনায় শান্তভাবে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। আন্না ক্লান্তভাবে তার পাশে বসে দেখছে। আলো জ্বালবার সাহস তার হয়নি, কিন্তু পাশের বাড়ীটা তখনো জ্বলছে. আর সেই আলোতে সে বাচ্চাটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। বাচ্চাটার কচি গলায় একটা ছোট্ট জন্মদাগ।

বেশ কিছু সময়, বোধহয় একঘন্টা, ঝি-টি দেখল বাচ্চাটা কেমন নিঃশ্বাস নিচ্ছে আর ছোট্ট হাতের মুঠি চুষছে। সে বুঝতে পারল, বড্ড বেশী সময় বসা হয়ে গেছে আর বড্ড বেশী দেখা হয়ে গেছে, এখন আর বাচ্চাটাকে ছেড়ে যাওয়া যায় না। অতি কষ্টে উঠে দাঁড়াল, ধীরে সুস্থে বাচ্চাটাকে একটা চাদর দিয়ে জড়াল, তাকে হাতের মধ্যে তুলে নিল, তারপর তাকে নিয়ে সেই জায়গা ছেড়ে রওনা হল ভয়ে ভয়ে চারদিক দেখতে দেখতে, মনে পাপ থাকলে লোকে যেমন যায় চোরের মত।

বোন আর ভগ্নীপতির সঙ্গে অনেক পরামর্শ করার পর দু'সপ্তাহ পরে সে বাচ্চাটাকে গ্রোসআর্টটিঙেন গ্রামে নিয়ে গেল। সেখানে তার দাদা চাষের কাজ করে। খামারবাড়ীটা তার দাদার স্ত্রীর, দাদা সেখানে ঘরজামাই। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, আন্না একমাত্র তার দাদাকে বাচ্চাটার আসল খবর হয়তো দিতে পারে। কারণ তারা সেই চাষী বৌকে কখনো চোখে দেখেনি আর জানতো না, এরকম একটা বিপজ্জনক বাচ্চাকে সে কিভাবে নেবে।

আন্না দুপুর নাগাদ সেই গ্রামে পৌঁছল। তার দাদা, দাদার বৌ আর মজুররা তখন খেতে বসেছে। আন্নাকে তেমন খারাপ ভাবে নিল না ওরা। কিন্তু তার নতুন বৌদির দিকে এক নজর দেখেই বুঝল, বাচ্চাটাকে নিজের

বলতে হবে। তাই যখন সে বলল, তার স্বামী দূরের এক গ্রামে একটা খামারে চাকরি করে আর সেখানে সে বাচ্চা সমেত আন্নাকে দু-চার সপ্তাহ পরে আশা করছে, তখন সেই চাষী বৌ হৈ-হৈ করে উঠল আর বাচ্চাটাও স্বাভাবিক প্রশংসা পেল।

বিকেলে আন্না তার দাদার সঙ্গে বনে গেল কাঠ আনতে। ওরা একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসল। তখন আন্না তার দাদাকে আসল ঘটনা খুলে বলল। আন্না বুঝতে পারল, তার দাদা খুব অস্বস্তিতে পড়ল। খামারবাড়ীতে তার নিজের অবস্থা তেমন ভাল না। তবে আন্না যে তার বৌ-এর কাছে এসব কথা বলেনি সেজন্য সে আন্নার বুদ্ধির খুব তারিফ করল। বোঝা গেল, সেই প্রোটেস্টাণ্ট বাচ্চার বোঝা তার অল্পবয়সী বৌ তেমন ভালভাবে নেবে না। বানিয়ে বলা কথাই ঠিক রাখা ঠিক করল তার দাদা।

কিন্তু বেশীদিন আর তা করা সহজ নয়।

আন্না মাঠে কাজ করত আর অন্য সকলে যখন বিশ্রাম করত তখন সে ছুটে বাড়ী আসত 'তার' বাচ্চাকে দেখাশুনা করতে। বাচ্চাটা বড় হয়ে উঠল, এমন কি মোটাসোটাও হয়ে উঠল। আন্নাকে দেখলেই হাসত আর মাথা তুলতে চেষ্টা করত। কিন্তু তারপর শীত এল, বৌদিটি শুরু করল আন্নার স্বামীর খবর নিতে।

আন্নার খামারবাড়ীতে থাকাতে কোনো আপত্তি ওঠেনি, তাকে দিয়ে অনেক কাজ হয়। কিন্তু অসুবিধা হল প্রতিবেশীদের নিয়ে। তারা আন্নার বাচ্চার বাবা বাচ্চাটাকে একবার দেখতেও আসে না দেখে অবাক হতো। বাচ্চাটার একটা বাবা না দেখাতে পারলে খামারবাড়ীতে এই নিয়ে কথা উঠতে দেরী হবে না।

এক রবিবার সকালে সেই চাষী তার ঘোড়ার গাড়ী জুড়ল, তারপর আন্নাকে হাঁক দিল সঙ্গে যাবার জন্য ; পাশের গ্রাম থেকে একটা বাছুর আনতে হবে। ঘোড়ার গাড়ী যখন খট্‌খটিয়ে চলছে তখন সে জানাল যে আন্নার জন্য একটা স্বামীর খোঁজ করেছিল এবং একজনকে পেয়েও গেছে। লোকটা চাষের মজুর, একটা কুঁড়েঘরে থাকে, মরতে বসেছে। ওরা যখন সেই কুঁড়েঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল তখন সেই লোকটার বলতে গেলে তার নোংরা বিছানা থেকে মাথা তোলার ক্ষমতাও নেই।

সে আন্নাকে বিয়ে করতে রাজী ছিল। তার মাথার কাছে তার মা

দাঁড়িয়ে। বয়স হয়েছে—চামড়ার রঙও হলুদ হয়ে উঠেছে। সেই কাজের জন্য তার কিছু দাবি ছিল।

দশ মিনিটের মধ্যে পাওনা-গণ্ডা নিয়ে কথা-বার্তা চুকে গেল। আম্রা আর তার দাদা বাছুর কিনতে রওনা হল। সেই সপ্তাহের শেষেই বিয়েটা হয়ে গেল। পাত্রী যখন বিড়বিড় করে বিয়ের মন্ত্র উচ্চারণ করছিল তখন সেই রোগী কিন্তু একবারও তার কাঁচের মত চোখ আম্রার দিকে ফেরায়নি। আম্রার দাদার কোনো সন্দেহই ছিল না যে লোকটা দু-একদিনের মধ্যেই মারা যাবে। তাহলে আম্রার স্বামী আর ওই বাচ্চার বাবা তাদের কাছে আসবার পথে আউগ্‌সবুর্গ-এর কাছে একটা গ্রামে মারা যাবে, তাহলে আর বিধবা আম্রার তার দাদার বাড়ীতে থাকা নিয়ে কেউ অবাক হবে না।

এই অদ্ভুত বিয়ে শেষ হলে আম্রা খুশি মনে ফিরে এল—এ বিয়েতে গীর্জার ঘণ্টা বাজেনি, ব্যাণ্ডও বাজেনি। মেয়েরা উপস্থিত ছিল না, নিমন্ত্রিতও ছিল না কেউ। আম্রার বিয়ের পর জুটল এক টুকরো রুটির সঙ্গে একটু চর্বি তার দাদার খাবার ঘরে, তারপর দাদার সঙ্গে গেল বুড়িটার কাছে, যেখানে বাচ্চাটা শুয়ে, সে একটা নাম পেল। আম্রা বিছানাটা ঠিক করে তার দাদার দিকে তাকিয়ে হাসল।

ওদিকে কিন্তু সেই লোকটির মরবার কোনো লক্ষণ নেই।

পরের সপ্তাহে নয়, তার পরের সপ্তাহেও না—সেই বুড়ীর কাছ থেকে কোনো খবরই এল না। আম্রা খামারবাড়ীতে সবাইকে বলে রেখেছে, তার স্বামী এখানে আসবার জন্য রওনা হয়ে গেছে। লোকে যখন তাকে জিজ্ঞাসা করে, আসছে না কেন, তখন আম্রা বলতে শুরু করেছে, এত বরফ পড়েছে তাই বুঝি তার আসতে দেরী হচ্ছে। তারপর যখন আরো তিন সপ্তাহ কেটে গেল তখন তার দাদা সত্যি সত্যিই অস্থির হয়ে আউগ্‌সবুর্গ-এর পাশের সেই গ্রামের পথে রওনা হল।

অনেক রাতে সে ফিরে এল। আম্রা তখনো জেগেই ছিল। খামার-বাড়ীতে গাড়ীর আওয়াজ শুনেই সে ছুটল দরজার দিকে। দেখল, তার দাদা কেমন ধীরে-সুস্থে ঘোড়াটাকে গাড়ী থেকে আলাদা করছে। আম্রার বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে শুরু করল।

দাদা খারাপ খবর নিয়ে এসেছে। সে সেই কুঁড়েঘরে ঢোকবার সময় ঐ

আধবয়সী ব্যক্তিকে খাবার টেবিলে দেখতে পায়। গায়ে শুধু একটা শার্ট আর মুখ ভর্তি খাবার চিবোচ্ছিল। লোকটা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে।

আরো সব বলবার সময় চাষী আর আন্নার মুখের দিকে তাকাল না; সেই লোকটার নাম হচ্ছে পট্যারায়ার, আর তার মাও এমন ঘটনায় আশ্চর্য হয়ে পড়েছিল বলে মনে হয়, তাই কি করা যায় তা ঠিক করে উঠতে পারছিল না। পট্যারায়রকে দেখে তেমন খারাপ মনে হয়নি। সে সামান্ত কথা বলেছে, তবে একবার যখন তার মা গজগজ শুরু করতে যাচ্ছিল যে এখন তাদের ঘাড়ে এক উটকো বৌ আর কার না কার এক ছেলে এসে চেপে বসল, তখন সে তাকে চুপ করতে বলে। যতক্ষণ কথা-বার্তা চলছিল, ততক্ষণ সে আপন মনে তার চীজ্ খেয়েছে। এই চাষী যখন চলে আসে তখনো সে খাচ্ছিল।

পরের কটা দিন আন্নার স্বাভাবিক ভাবেই খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটল। বাড়ীর কাজ-কর্মের ফাঁকে সে বাচ্চাটাকে হাঁটতে শেখাতো। ও যখন দুহাত বাড়িয়ে টলমলে পায়ে এগিয়ে আসত তখন আন্না শুকনো কান্নাটা গিলে ফেলত, তারপর ওকে জড়িয়ে ধরত বুকে চেপে। একবার সে তার দাদাকে জিজ্ঞাসা করেছিল: লোকটা কী রকম? আন্না তাকে শুধু মৃত্যুশয্যায় দেখেছিল, তাও সন্ধ্যার পর—একটা কালো মোমবাতির আলোয়। এখন সে জানতে পারল, তার স্বামী খাটতে খাটতে শেষ হয়ে যাওয়া বছর পঞ্চাশ বয়সী একজন, ঐসব চাষের মজুরদের যেমন হয়ে থাকে, তেমনি আর কি।

কদিন পরেই আন্না তার দেখা পেল। একজন ফেরিওয়ালা অনেক কায়দা করে গোপনে তাকে খবর দেয়, "এক বিশিষ্ট পরিচিত লোক" তার সঙ্গে অমুক দিনে অমুক সময়ে অমুক গ্রামের কাছে, যেখানে পায়ে চলার পথটা লাগুস-মার্গ-এর দিকে বাঁক নিয়েছে, সেখানে দেখা করতে চায়। এমনি করে দেখা হল বিবাহিত দম্পতির, তাদের দুজনের গ্রামের মাঝামাঝি জায়গায়, যেন দুই সেনাপতি তাদের যুদ্ধক্ষেত্রের সীমায়, বরফে ঢাকা খোলা মাঠে।

লোকটাকে আন্নার পছন্দ হল না।

তার দাঁতগুলো ছোট ছোট আর ছাই রঙের, আন্নাকে মাথা থেকে পা অবধি দেখল, যদিও আন্নার গায়ে ভেড়ার চামড়ার মোটা পোশাক পরা ছিল, আর দেখবার মত তেমন কিছু ছিল না, তারপর "বিয়ের শপথ" কথাটা উচ্চারণ করল। আন্না তাকে সংক্ষেপে বলল, তাকে সবটা আরেকবার ভেবে দেখতে হবে, আর সে যেন যে-কোনো বাবসায়ী কিংবা কসাই, যে গ্রাম-

আইটিজেন-এর ওপর দিয়ে যাবে তার মুখে আমার বৌদির কাছে খবর পাঠায় যে সে শিগগিরই আসছে, আর বলে যে পথে অসুখ হয়ে পড়েছে।

ওট্যারার তার স্বভাব মত ধীরে মাথা নাড়ল। লোকটা আমার চেয়ে লম্বায় একমাথা বড় আর আম্রা যখন কথা বলছিল তখন সে শুধু আমার গলার বাঁ দিকটা দেখছিল, তাতে আমার বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল।

খবর নিয়ে কিন্তু কেউ এল না, আম্রা তখন ভাবতে শুরু করল, বাচ্চাটাকে নিয়ে সোজা আরো দক্ষিণ দিকে চলে যাবে, কেম্পটেন কিম্বা সনটোফেন-এ, একটা কাজের খোঁজে। কিন্তু, মাঠের মধ্যেকার ঐসব রাস্তার বিপদের কথা লোকে বলে, তাছাড়া তখন মাঝ শীত, তাই সে রয়ে গেল।

এদিকে খামারবাড়ীতে থাকা কিন্তু কঠিন হয়ে উঠল। বৌদি দুপুরে খাওয়ার সময় সব মজুরদের সামনে তার স্বামী সম্বন্ধে অবিশ্বাস প্রকাশ করে প্রশ্ন করত। একবার যখন সে কপট করুণা দেখিয়ে বাচ্চাটাকে "বেচারী খোকা" বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল, তখন আম্রা যাওয়াই ঠিক করে ফেলে, কিন্তু তখন আবার বাচ্চাটার অসুখ করল।

বাচ্চাটা বিছানায় শুধু ছটফট করে, মুখটা টকটকে লাল, চোখদুটো ঘোলাটে, আর আম্রা সারারাত তার ঝুড়ির পাশে বসে থাকে ভয় আর আশা নিয়ে। তারপর বাচ্চাটার অবস্থা ক্রমশ ভালর দিকে গেল, তার হাসি ফিরে এল, তখন একদিন দুপুরের আগে দরজায় টোকা পড়ল, ভেতরে এল ওট্যারার।

সেই ঘরে আম্রা আর বাচ্চাটা ছাড়া তখন আর কেউ নেই। তাই আমার আতঙ্ক চাপা দেবার দরকার হয়নি, আর তা হয়তো সম্ভবও হতো না। বেশ অনেকটা সময় তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ওট্যারার বলল, সে সবটা ভেবে দেখেছে, আর এখন এসেছে আম্রাকে নিয়ে যেতে। সে আবার বিয়ের শপথের কথা উল্লেখ করল।

আম্রার রাগ হল। চাপা গলায় হলেও স্পষ্ট ভাবে সে লোকটিকে জানিয়ে দিল, তার সঙ্গে বাস করার কথা সে চিন্তাও করে না, সে কেবলমাত্র বাচ্চাটার জন্য বিয়ে করেছে এবং বাচ্চার একটা নাম ছাড়া লোকটির কাছে সে আর কিছু চায় না।

আম্রা যখন বাচ্চাটার কথা বলছিল তখন ওট্যারার বাচ্চাটা যে ঝুড়ির মধ্যে কলকল করছিল সেদিকে এক নজর তাকিয়েছিল, তবে সেদিকে এগোয়নি। তাতে আম্রার রাগ তার ওপর আরো বেড়ে গেছিল।

লোকটা আরো দুচারটে গোছানো কথা বলল ; আন্নার আর একবার সবটা ভেবে দেখা উচিত, তাদের বাড়ীতে হরিনটির রান্না হয় তাই তার মা রান্নাঘরে শুতে পারবে। এখন সময় চাষী বৌ এল, কৌতূহলের সাথে ভালমন্দ কথা বলল তারপর তাকে দুপুরের খাওয়া খেতে অনুরোধ করল। খাবার টেবিলে বসবার সময় চাষীর দিকে সাদামাটা ভাবে মাথা নাড়ল, যার অর্থ তাকে চেনে না হয় আবার চেনে তাও প্রকাশ পায় না। চাষী বৌ-এর সব প্রশ্নের জবাব এক কথায় দিল, তার চোখ দুটো কখনো খাবারের প্লেট থেকে তোলেনি। তার বক্তব্য, সে মেরিং-এ একটা কাজ পেয়েছে, আন্না এখন তার কাছে গিয়ে থাকতে পারে। অবশ্য সেটা যে তক্ষুনি হতে হবে, এমন কথা আদৌ বলল না।

বিকেলে সে চাষীর সঙ্গ এড়িয়ে গেল, কেউ কিছু না বলা সত্ত্বেও বাড়ীর পেছনে গিয়ে কাঠ কাটতে শুরু করল। সন্ধ্যার খাবারে বসেও সে কারো সঙ্গে কথা বলল না। খাওয়ার শেষে চাষী-বৌ নিজে আন্নার ঘরে একটা লেপ নিয়ে এল, রাতে শোবার সময় লাগবে , কিন্তু তখনই সে চোখে পড়বার মত ধীরে-সুস্থে উঠে দাঁড়াল, বিড়বিড় করে বলল, তাকে সেই রাতেই নাকি ফিরতে হবে। যাবার আগে বাচ্চা সমেত ঝুড়িটার দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে রইল, কোনো কথা কিন্তু বলল না, একবার স্পর্শও করল না তাকে।

সেই রাতে আন্নার অসুখ করল, জ্বর এল—এক সপ্তাহ অসুস্থ রইল। বেশীরভাগ সময়েই তার কিছু করবার উপায় ছিল না, শুয়ে থাকত। দু-চারবার দুপুরের দিকে জ্বরটা একটু কমলে কোনো-ক্রমে হামাগুড়ি দিয়ে বাচ্চাটার ঝুড়ির কাছে গিয়ে তার বিছানাটা ঠিক করে দিত।

তার অসুখের চতুর্থ সপ্তাহে ওট্টায়ার খামারবাড়ীতে একটা গাড়ী নিয়ে হাজির, আন্নাকে আর বাচ্চাটাকে নিয়ে রওনা হল। আন্না মুখ বুজে সব ঘটতে দিল।

আন্নার শক্তি ফিরে পেতে অনেক সময় লাগল, চাষ-মজুরের বাড়ীর পাতলা স্যুপ খেয়ে তার বেশী আশা করা যায় না। কিন্তু একদিন সকালে দেখল বাচ্চাটাকে কি নোংরা ভাবে রাখা হয়েছে, সে তখন কর্তব্য ঠিক করে উঠে দাঁড়াল।

বাচ্চাটা মিষ্টি হেসে বুঝি আন্নাকে অভ্যর্থনা জানাল। আন্নার দাদা বলত, ঐ হাসি নাকি বাচ্চাটা আন্নার কাছ থেকে পেয়েছে। বাচ্চাটা বড় হয়ে

উঠেছে, ঘরের চারদিকে আশ্চর্য দ্রুত গতিতে হামা দিয়ে ঘুরছে, হাত ছুটোয় খপাস্ খপাস্ করে শব্দ করছে মেঝের ওপর আর হুমড়ি খেয়ে পড়লে একটুখানি করে কেঁদে উঠছে। একটা কাঠের বালতিতে তাকে পরিষ্কার করে স্নান করিয়ে তারপর আন্না তার শান্তি ফিরে পেল।

সামান্ত কদিন পর ঐ কুঁড়ে ঘরের জীবন আন্না আর কিছুতেই সহ্য করতে পারল না। কয়েকটা কাঁথা দিয়ে বাচ্চাকে জড়াল, একটা রুটি নিল আর সামান্ত চীজ, তারপর পালাল।

ইচ্ছা ছিল সনটোফেন-এ যাবে, কিন্তু বেশী দূর এগোতে পারল না। তার পায়ে তখনো জোর ফিরে পায়নি, মাঠের রাস্তায় বরফের কাদা, আর সব গ্রামের লোকেই যুদ্ধের দরুণ বেশ সন্দেহ বাতিকে ভুগছে, কঞ্জুস হয়ে উঠেছে। এই ভাবে পথ চলার তৃতীয় দিনে রাস্তার ধারের গর্তে পড়ে আন্নার পা মচকে গেল, বেশ কয়েক ঘন্টা পর তাকে একটা খামারবাড়ীতে নিয়ে আসা হল, এই সময়টা তার ছেলেটার কথা ভেবে আতঙ্কে কাটল। সেই খামারবাড়ীতে তাকে গোয়াল ঘরে শুয়ে থাকতে হল। বাচ্চাটা গরুগুলোর পায়ের ফাঁকে ফাঁকে হামা দিয়ে ঘুরছিল আর আন্না আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলে শুধু হাসছিল। অবশেষে আন্না সেই খামারবাড়ীর লোকদের কাছে তার স্বামীর নাম বলতে বাধ্য হল, চাষী তখন তাকে আবার মেরিং-এ ফিরিয়ে দিয়ে এল।

এর পর আন্না আর পালাবার চেষ্টা করল না, অদৃষ্টকে মেনে নিল। প্রচণ্ড পরিশ্রম করত। সামান্য জমি থেকে কিছু বার করা বা জোট্ট সেই সংসার চালানো কঠিন। যাই হোক তার স্বামী তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না. আর বাচ্চাটাও ভরপেট খেতে পায়। তার দাদাও মাঝে মধ্যে আসে, আর সঙ্গে করে এটা সেটা উপহার আনে, একবার তো আন্না বাচ্চাটার ছোট্ট কোটটা লাল রঙ করিয়ে নিতে পেরেছিল। তখন সে ভেবেছিল, রঙের কাজ করত যার বাবা তার ছেলেকে সেটা ভাল মানায়।

এই ভাবে দিন কাটতে থাকল, আন্নাও সন্তুষ্ট। বাচ্চাটাকে মানুষ করে তুলতে সে প্রচুর আনন্দ পায়। এমনি করে বেশ কয়েক বছর কেটে গেল।

কিন্তু একদিন আন্না গ্রামে গেছিল সিরাপ আনতে, ফিরে এসে দেখল বাচ্চাটা ঘরে নেই, তখন তার স্বামী তাকে বলল, সুন্দর পোশাক পরা একজন মহিলা চমৎকার একটা ঘোড়ার গাড়ীতে করে এসে বাচ্চাটাকে নিয়ে গেছে।

কথাশায় আন্না সেখানে থাকা গেল, আর সেই দিনই সন্ধ্যায় একটা ছোট্ট পুঁটলীতে খাবার নিয়ে আউগ্‌সবুর্গ-এর পথে রওনা হল।

সেই শহরে পৌঁছে প্রথমেই গেল ট্যানারীতে। তাকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হল না, আর বাচ্চাটাকে দেখতে পেল না।

বোন আর ভগ্নীপতি দুখাই তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। সে রাজকর্মচারীদের কাছে গেল, কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে চেঁচামেচি করল, তার বাচ্চাকে চুরি করে নিয়েছে। সে এমন কথাও বলল, যার অর্থ হয়, প্রোটেস্টান্টরা তার ছেলে চুরি করেছে। তখন সে জানতে পারল যে সময় পাল্টে গেছে, ক্যাথলিক আর প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে এখন শান্তি স্থাপিত হয়েছে।

তার ভাগ্য বিশেষ ভাল না হলে তার কিছুই হয়তো উপকার হতো না। তার মামলার বিচারের ভার পড়ল একজন বিচারকের ওপর, লোকটা অদ্ভুত প্রকৃতির।

বিচারকের নাম ইগনাৎস ডলিঙার, সারা শোয়াবিয়া এলাকা জুড়ে তার কর্কশ ব্যবহার আর শিক্ষা দেবার কথা সবাই জানত। ব্যাভেরিয়ার রাজার সঙ্গে তার একবার আইনের লড়াই হয়েছিল। সেই রাজা তার নাম দেয় "এই ল্যাটিনীয় নোংরা চাষা"। নীচু সম্প্রদায়ের লোক ভবে শেষ পর্যন্ত লোকে তার গুণগানই করেছে।

বোন ভগ্নীপতি সঙ্গে নিয়ে আন্না তার কাছে গেল। সেই বেঁটে অসম্ভব মোটা বুড়ো লোকটা একটা ছোট্ট ফাঁকা ঘরে গাদাগাদা পার্চমেন্ট কাগজের মধ্যে বসে আন্নার কথা খুব সামান্য শুনল। তারপর একটা পাতায় কি একটা লিখে, ধমকে উঠল, "ওখানে গিয়ে দাঁড়াও, জলদি কর।" তার ছোট মোটা হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল জায়গাটা, সেখানে সরু জানালা দিয়ে এককালি আলো এসে পড়েছে। কয়েক মিনিট ধরে আন্নার মুখটা দেখল, তারপর ঠেকুর তুলে চলে যাবার ইশারা করল।

পরদিন একজন কর্মচারীকে দিয়ে আন্নাকে ডেকে পাঠাল, আন্না দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়াতেই তাকে ধমকে উঠল: 'ট্যানারী আর তার সব সম্পত্তি চাও, সে ব্যাপারে আমাকে একটা কথাও বলনি কেন?"

আন্না থতমত খেয়ে বলল, সে শুধু বাচ্চাটাকে চায়।

"ভেব না যে তুমি ঐ ট্যানারীর দখল পাবে", বিচারক চিৎকার করে উঠল,

"ঐ বেজন্মাটা যদি সত্যি সত্যিই তোমার হয়, তবে ঐ ট্যানারীর মালিক হবে ওদের কোনো আত্মীয়।"

আন্না তার দিকে চোখ না তুলে মাথা নাড়ল। তারপর বলল, "ট্যানারী দরকার নেই।"

"ছেলেটা তোমার?" হুঙ্কার দিয়ে উঠল বিচারক।

"হ্যাঁ", আন্না বলল আস্তে করে। "ও সব কথা শিখে উঠতে পারা পর্যন্ত যদি পেতাম। ও সবে সাতটা কথা বলতে পারে।"

বিচারক একটু কাশল, তারপর তার টেবিলের পার্চমেন্টগুলো গোছ-গাছ করল। এবার শান্ত ভাবে তবে বেশ বিরক্তির সঙ্গে বলল:

"তুমি চাও এই ছানাটা, আর ওদিকে পাঁচটা সিল্কের পেটিকোট পরা ছাগলটা তাকে চায়। ছেলেটার দরকার একটি আসল মা।"

"হ্যাঁ", বলল আন্না, তারপর তাকাল বিচারকের দিকে।

"ভাগো এখন", হুঙ্কার দিয়ে উঠল বিচারক। "শনিবার বিচার করব।"

সেই শনিবার বড় রাস্তা আর প্যারলাখট্টর্ম-এর ওপর সিটি হলের সামনের জায়গা মানুষের ভিড়ে কালো হয়ে উঠল, সবাই সেই প্রোটেস্টান্ট-এর শিশুর মামলা দেখতে চায়। এই অদ্ভুত মামলা শুরু থেকেই প্রচুর উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। সব পরিবারে এবং হোটেল-রেস্তোরাঁয় অনেক তর্ক বিতর্ক হয়েছে, কে প্রকৃত মা আর কেই বা নকল। তাছাড়া সেই বুড়ো ডলিঙার-ও তার বিখ্যাত শুনানি আর কটুক্তি ও সেই সঙ্গে সুবিচারের জন্য ওই এলাকা জুড়ে খুব নাম করেছিল। তার মামলাগুলো মজার হুল্লোড় বা মেলার চেয়ে বেশী পছন্দ করত লোকে।

তাই সেই সিটি হলের সামনে শুধু আউগ্সবুর্গ-এর লোকই না, সেই এলাকার চাষীও কম জড়ো হয়নি। শুক্রবার হাটবার গেছে, শুনানি শোনবার আশায় তারা শহরেই রাত কাটিয়েছে।

যে বিশাল হলঘরে ডলিঙার বিচার করত, সেটার নাম ছিল 'স্বর্ণ-কক্ষ'। সমস্ত জার্মানীতে পিলার ছাড়া এত বড় ঘর আর ছিল না, সেই জন্য সেটা বিখ্যাত ছিল। সেই ঘরের সিলিং শেকল দিয়ে ছাদের কাঠামো থেকে ঝোলানো ছিল।

একটা লম্বা দেওয়ালের গায়ে বসানো ব্রোঞ্জের কপাট বন্ধ করা দরজার সামনে ডলিঙার বসে, একটা ছোটখাট গোল মাংসের পাহাড়। একটা সাধারণ

দড়ি দিয়ে শ্রোতাদের জায়গা আলাদা করে দেয়া হয়েছে। বিচারক কিন্তু বেঞ্চের ওপর বসা, তার সামনে কোনো টেবিলও ছিল না। বেশ কয়েক বছর হল নিজে এই ব্যবস্থা করেছে। সাদাসাটা ব্যাপারই তার পছন্দ।

দড়ির সীমানার ভেতরে ক্রাউ ৎসিঙলি তার বাবা-মায়ের সাথে, মৃত হেরার ৎসিঙলির আত্মীয়রা এসেছে সুইজারল্যাণ্ড থেকে—দুজন ভাল পোশাক পরা অভিজাত লোক, দেখে মনে হয় অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী, আর আন্না ওট্টারার তার বোনের সাথে। ক্রাউ ৎসিঙলির পাশে আয়ার কোলে বাচ্চাটাকে দেখা যাচ্ছে।

সবাই, বাদী-বিবাদী এবং সাক্ষীরা দাঁড়িয়ে। বিচারক ডলিঙার বলে, সাক্ষী-সাবুদের দাঁড়িয়ে থাকতে হলে মামলার নিষ্পত্তি তাড়াতাড়ি হয়। এমনও হতে পারে, ওদের দাঁড় করিয়ে রাখত নিজেকে লোকের চোখের আড়ালে রাখবার জন্য, তাকে দেখতে হলে পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে ঘাড় লম্বা করে দাঁড়াতে হতো।

শুনানির শুরুতেই একটা ঘটনা ঘটে গেল। আন্নাকে দেখতে পেয়েই বাচ্চাটা চিৎকার করে উঠল আর এগিয়ে এল, ও আন্নার কাছে যেতে চায়। আয়ার কোলের মধ্যে ধস্তাধস্তি করতে শুরু করল, আর সেই সঙ্গে কান্না। বিচারক বাচ্চাটাকে ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে বলল।

এবার ক্রাউ ৎসিঙলিকে ডাক দিল।

সে ছুটে সামনে এল, একটা রুমাল নিয়ে মাঝে মধ্যে চোখের সামনে ঝুলিয়ে বলল, কাইজারের সৈন্যদের লুঠ-তরাজের সময় সে কেমন করে বাচ্চাটার কাছ থেকে আলাদা হয়ে পড়ে। সেই রাতেই ঝি-টা তার বাবার বাড়িতে আসে আর খবর দেয় যে বাচ্চাটা তখনো ঐ বাড়ীতে আছে, বোধহয় বকশিশ-এর আশায়। তার বাবার বাড়ীর একজন রাঁধুনীকে সেই ট্যানারীতে পাঠানো হয়, কিন্তু সে বাচ্চাটাকে আর দেখতে পায়নি। তার ধারণা, ও (আন্নাকে দেখাল) তাকে নিয়ে গেছে, কোনো জবরদস্তি করে কিছু অর্থ আদায় করবার আশায়। সময় মত বাচ্চাটাকে উদ্ধার করে না আনলে, ও ঠিকই কোনোদিন ওরকম দাবি নিয়ে হাজির হত।

বিচারক এবার হেরার ৎসিঙলির আত্মীয় দুজনকে সামনে আসতে বলে জানতে চাইল, সেই সময়ে তারা হেরার ৎসিঙলির খোঁজ করছিল কিনা এবং ক্রাউ ৎসিঙলি তাদের কি বলেছিল।

তারা বলল, ক্লাউ ৎসিঙলি তাদের জানিয়েছিল, তার স্বামী মারা গেছে আর বাচ্চাটাকে একটা ঝিয়ের জিম্মাদারীতে রাখা হয়েছে, সেখানে সে নিরাপদে আছে। তারা ক্লাউ ৎসিঙলির প্রসঙ্গে বেশ কষ্ট ভাব প্রকাশ করেছিল, তাতে অবশ্য আশ্চর্য হবার মত কিছু ছিল না, কারণ ক্লাউ ৎসিঙলি মামলায় হেরে গেলে সম্পত্তিটা তাদের দখলে আসবে।

এদের কথা শেষ হলে বিচারক আবার ক্লাউ ৎসিঙলিকে ডাকল, তারপর তার কাছে জানতে চাইল, সেই আক্রমণের সময় সে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বাচ্চাটাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে চলে গেছিল কিনা।

ক্লাউ ৎসিঙলি যেন অবাক হয়েছে এমনি ভাবে ফ্যাকাসে নীল চোখে বিচারকের দিকে তাকাল, তারপর আহত স্বরে বলল, সে তার বাচ্চাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে যায়নি।

বিচারক ডলিঙার গলা ঝেড়ে বেশ উৎসাহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, সে একথা বিশ্বাস করে কিনা, যে কোনো মা তার বাচ্চাকে অসহায় অবস্থায় ফেলতে পারে না।

হ্যাঁ, সেকথা সে বিশ্বাস করে, জোর দিয়ে বলল ক্লাউ ৎসিঙ'ল।

তাহলে সে বিশ্বাস করে কিনা, বিচারক আরো জানতে চাইল, যে মা এমন কাজ করে, তার পাছায় বেশ কয়েক ঘা বসিয়ে দেওয়া উচিত, তা সে তার পরনে যত খুশি পেটিকোটই থাকুক না কেন ?

ক্লাউ ৎসিঙলি কোনো উত্তর দিল না। বিচারক তখন সেই কালের ঝি আন্নাকে ডাক দিল। আন্না তাড়াতাড়ি সামনে এসে দাঁড়িয়ে মৃদু গলায় শুনানির আগে যা বলেছিল, তাই বলল। সে কথা বলছিল, কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন সে সেই সঙ্গে কান পেতে কি শুনছে। বারে বারেই বিশাল দরজাটার দিকে তাকাচ্ছিল, ওই দরজা দিয়ে বাচ্চাটাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তার ভয় হচ্ছিল, বাচ্চাটা বুঝি এখনও কাঁদছে।

আন্না বলল, সে অবশ্য সেই রাতে ক্লাউ ৎসিঙলির কাকার বাড়ীতে গেছিল। তবে তারপর আর সেই ট্যানারীতে ফিরে যায়নি। কাইজারের সৈন্যদের ভয়ে, তাছাড়া তার নিজের কুমারী অবস্থার বাচ্চার জন্যও তার দুশ্চিন্তা ছিল। সেই বাচ্চাকে পাশের গ্রাম লেখহাউসেন-এ ভাল লোকেদের জিম্মায় রাখা হয়েছিল।

বুড়ো ডলিঙার তাকে ধমক দিয়ে বাধা দিয়ে বলল, তাহলে সে সময়ে এই

শহরে অন্তত একজন লোক ছিল, যার মধ্যে ভয় জাতীয় একটা অনুভূতি দেখা দিয়েছিল। সেটা সঠিকভাবে জানতে পেরে সে খুশি, কারণ তার থেকেই প্রমাণ হয়, অন্তত একজনের মধ্যে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তখন ছিল। সাক্ষী যে শুধু নিজের ছেলের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, এটা অবশ্যই ভাল কথা নয়, তবে একটা কথা আছে—রক্তের টান। তাছাড়া, প্রকৃত মা সন্তানের জন্য চুরিও করতে পারে। সেটা অবশ্যই আইনত সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। কারণ অপরের জিনিস অপরেরই জিনিস। আর যে চুরি করে সে মিথ্যা কথাও বলে এবং মিথ্যাচারও আইনের চোখে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তারপর আদালতকে ধোঁকা দেয় যেসব লোকেরা তাদের স্বার্থপরতার ওপর তার আর সব বক্তৃতার মধ্যে একটা বিচক্ষণ এবং স্পষ্ট বক্তৃতা দিল, ফলে তাদের মুখ কাল হয়ে উঠল; এরপর নির্দোষ গরুগুলোর দুধে জল মেশায় যেসব গয়লা আর শহরের কর্তৃস্থানীয় অফিসার, যে চাষীদের কাছ থেকে অত্যধিক কর আদায় করে, যাদের সঙ্গে এই মামলার কোনো সম্পর্ক নেই, তাই নিয়ে একটুখানি তামাসা করে জানাল, সাক্ষ্য নেওয়া শেষ এবং তার থেকে কোনো সিদ্ধান্তে আসা গেল না।

তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল, আর তার নিরুপায় ভাবের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ করল। চারদিকে তাকাতে থাকল যেন কেমন করে একটা নিষ্পত্তি করা যায় সেই ব্যাপারে যে কোনো তরফ থেকে একটা বুদ্ধি আশা করছে।

সবাই বোকা বনে গিয়ে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে, কেউ কেউ গলা লম্বা করে অসহায় বিচারককে এক নজর দেখার চেষ্টা করছে, সে লোকটি কিন্তু সম্পূর্ণ শান্তভাবে ঘরের মধ্যে বসে। শুধু রাস্তা অবধি জড়ো হওয়া মানুষের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

তারপর নিশ্বাস ফেলে বিচারক আবার মুখ খুলল।

"কে প্রকৃত মা, সেটার নিষ্পত্তি হল না", বলল। "বাচ্চাটার জন্য দয়া হয়। একথা প্রায়ই শোনা গেছে, বাবারা প্রায়ই কেটে পড়ে, বাবা হতে চায় না, তারা সব বেহায়া, কিন্তু এখানে একসাথে দুটো মা হাজির। আদালত এতক্ষণ তাদের বক্তব্য শুনল, প্রত্যেকেই সুযোগ পেয়েছে, নিয়ম-মাফিক পুরো পাঁচ মিনিট ধরে বলবার, এবং আদালত নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পেরেছে, দুজনেই তাহা মিথ্যা বলছে। কিন্তু এদিকে, আমরা সবাই জানি,

বাচ্চাটার কথাও ভাবতে হবে, ওর একটা মায়ের দরকার। সুতরাং কেবলমাত্র ফাঁকা বুলি না আউড়ে স্থির করতে হবে, কে প্রকৃত মা।"

তারপর বিরক্তভাবে আদালতের কর্মচারীকে হুকুম করল, একটা চক আনতে।

কর্মচারীটি গিয়ে এক টুকরো চক নিয়ে এল।

"চকটা দিয়ে ঐখানে মেঝেতে একটা গোল করে দাগ টান। এমন ভাবে টানবে যেন তার মধ্যে তিনজন দাঁড়াতে পারে।" বিচারক বুঝিয়ে দিল।

কর্মচারীটি হাঁটু গেড়ে বসে মেঝের ওপর ফরমাশ মত একটা বৃত্ত আঁকল।

"এবার বাচ্চাটাকে নিয়ে এস", বিচারক হুকুম করল।

বাচ্চাটাকে নিয়ে আসা হল। সে আবার চিৎকার জুড়ে দিল, আন্নার কাছে যেতে চায়। বুড়ো ডলিঙার সেই হট্টগোলের দিকে কর্ণপাত না করে তার বক্তব্য বলতে শুরু করল, শুধু গলার স্বর এবার একটু তুলে।

"যে পরীক্ষা এখন করা হবে", বলল, "সেটা আমি একটা প্রাচীন বই-এ পেয়েছি, এবং এটা এক্ষেত্রে ভাল চলবে। খড়ির চক্রের এই পরীক্ষার সহজ মূল কথা হচ্ছে যে এর সাহায্যে প্রকৃত মায়ের সন্তান স্নেহ প্রকাশ পায়। অর্থাৎ এই ভালবাসার গভীরতা যাচাই করা হবে। আরদালী, বাচ্চাটাকে ওই খড়ির চক্রের মাঝখানে রাখ।" আরদালী আন্নার কাছ থেকে বাচ্চাটাকে নিয়ে এল। সে এখনো চিৎকার করে চলেছে। তাকে সেই বৃত্তের মধ্যে নিয়ে গেল। বিচারক ফ্রাউ ৎসিঙলি আর আন্নার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরাও যাও ঐ বৃত্তের মধ্যে। প্রত্যেকে বাচ্চাটার একটা হাত ধরবে। তারপর আমি যখন বলব 'শুরু', চেষ্টা করবে বাচ্চাটাকে বৃত্তের বাইরে বার করে নিতে। তোমাদের মধ্যে যে বেশী ভালবাসে, সে টানবেও বেশী জোরে আর ওমনি করে বাচ্চাটাকে নিজের দিকে টেনে নিতে পারবে।"

হল ঘরটার মধ্যে অস্থিরতা দেখা গেল। দর্শকরা পায়ের আঙুলের ডগায় দাঁড়িয়ে তাদের সামনের লোকেদের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করল।

কিন্তু মেয়েরা সেই বৃত্তের মধ্যে ঢুকে বাচ্চাটার দুটো হাত ধরে দাঁড়াতেই সবাই চুপ করে গেল। বাচ্চাটাও বোবা হয়ে গেছে, ও বুঝতে পেরেছে, ওকে নিয়েই এত কাণ্ড। মুখটা চোখের জলে ভেসে গেছে, আন্নার দিকে প্রায় ঘুরে তাকিয়ে আছে। এইবার বিচারক হুকুম করল, "শুরু"। আর একটি মাত্র ঝটকা টানে ফ্রাউ ৎসিঙলি বাচ্চাটাকে সেই খড়ির বৃত্তের বাইরে

দিয়ে গেল। হতভম্ব এবং অবিশ্বাসের চোখে আয়া তার দিকে তাকিয়ে রইল। ওর ছোট ছোট দু'হাত ধরে একসঙ্গে দুদিক থেকে টানলে বাচ্চাটার ক্ষতি হতে পারে ভেবে সে সাথে সাথে হাত ছেড়ে দিয়েছে।

বুড়ো ডলিভার উঠে দাঁড়াল।

"তাহলে বোঝা গেল", জোর গলায় বলল, "প্রকৃত মা কে। ওই হতচ্ছাড়ীর কাছ থেকে সরিয়ে নাও। ও বাচ্চাটাকে অনায়াসে টুকরো টুকরো করে কাটতে পারে।" তারপর আয়ার দিকে তাকিয়ে মাথাটা একটু নেড়ে তাড়াতাড়ি হলঘর ছেড়ে চলে গেল তার সকালের খাবার খেতে।

আর তার পরের কয়েক সপ্তাহ ধরে সেই তল্লাটের চাষীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছে, তারা মোটেও অবাক হয়নি, সেই বিচারক যখন মেরিডন-এর মহিলাকে বাচ্চাটা দিতে বলে তখন নাকি চোখ টিপে ইশারা করেছিল।

সেই দুই ছেলে

১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসে, যখন হিটলারের যুদ্ধ শেষ হয়েছে তখন তুরিঙেন এলাকার এক চাষী-বৌ স্বপ্ন দেখে, তার ছেলে মাঠ থেকে ডাকছে। ঘুম চোখে বাড়ীর উঠোনে যাবার সময় তার মনে হল, তার ছেলে কলের কলের কাছে—জল খাচ্ছে। তাকে ডেকে কথা বলতে গিয়ে বুঝতে পারল, যেসব যুবক রাশিয়ান যুদ্ধবন্দী তার খামার বাড়ীতে কাজ করতে বাধ্য ছিল, এটি তাদের মধ্যে একজন। তার কয়েকদিন পর সেই চাষী-বৌ এক আশ্চর্য ঘটনা লক্ষ্য করল। কাছেই একটা জঙ্গল ছিল, সেখানে যুদ্ধবন্দীরা গাছের গুঁড়ি উপড়ে তোলার কাজ করছিল; চাষী-বৌ তাদের খাবার পৌঁছে দিতে গেছিল। ফিরে আসবার সময় মুখ ঘুরিয়ে সেই একই যুবক যুদ্ধবন্দীকে দেখে—বলা হয়নি, যুবকটি অসুস্থ—টিনের পাত্রটার দিকে তাকাতে, ওটা কে যেন তার দিকে এগিয়ে ধরে ছিল। যুবকটির মধ্যে হতাশা স্পষ্ট, আর হঠাৎ সেই মুখটা তার নিজের ছেলের মুখ হয়ে গেল। এই যুবকটির মুখের হঠাৎ পাল্টে তার নিজের ছেলের মুখ হয়ে যাবার ঘটনা তার পরের দিনগুলোতে প্রায়ই ঘটে ঘন ঘন। তারপর সেই যুদ্ধবন্দী অসুস্থ হয়ে পড়ে; শুশ্রূষাহীন অবস্থায় সে গোলাবাড়ীতে পড়ে থাকে। তাকে সুপথ্য দেবার ইচ্ছা চাষী-বৌ নিজের মধ্যে প্রবল হচ্ছে, টের পেল। তবে সে ব্যাপারে তার ভাই বাদ সাধল, সে যুদ্ধে পঙ্গু হয়ে ফিরে এসেছে, সেই খামার বাড়ীর তদারক করে, আর যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করে, বিশেষ করে সেই সময়টাতে, যখন সবই ওলট-পালট হয়ে যেতে শুরু করেছে আর গাঁয়ের সবাই যুদ্ধ-বন্দীদের ভয় পেতে শুরু করেছে। চাষী-বৌ নিজে তার ভাই-এর যুক্তি উপেক্ষা করতে পারেনি; এইসব বন্দীদের সম্বন্ধে সে এত ভয়ঙ্কর সব কথা শুনেছে যে তাদের সাহায্য করা তার কাছে কোনমতেই উচিত মনে হয়নি। সে ভয়ে ভয়ে ছিল, তার ছেলে পূর্ব দিকে আছে, তার কি হাল এই শত্রুরা করতে পারে ভেবেই ভয়। তাই এই বন্দীর অসহায় অবস্থায় তাকে সাহায্য

করবার পাহারা উপেক্ষাও তখনো পালন করেনি, তখন একদিন সন্ধ্যায় বরফে ঢাকা কলের বাগানে একজন বন্দীকে হঠাৎ দেখে ফেলে, তারা ব্যস্তভাবে নিজেদের মধ্যে কি যেন কথাবার্তা বলছিল, যাতে ব্যাপারটা কেউ জানতে না পারে সেইজন্য বোধহয় তারা ঐ ঠাণ্ডার মধ্যে তাদের আলোচনা সারছিল। সেই যুবকটি সেখানে তাদের মধ্যে ছিল, জ্বরে কাঁপছিল, আর খুব সম্ভব তার বিশেষ দুর্বল অবস্থার দরুণই চাষী-বৌকে তাদের সামনে দেখে সবচেয়ে বেশী আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। সেই আতঙ্কের মধ্যে এবার আবার তার মুখের সেই অদ্ভুত পরিবর্তন হল, চাষী-বৌ যেন তার ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, ব্যাপারটা অত্যন্ত আতঙ্কিত হবার মত। এই ঘটনা তার ভেতরে গভীর ভাবে কাজ করে চলে। তাই যদিও কর্তব্য রক্ষার প্রয়োজনে সে তার ভাইকে কলের বাগানে সেই আলোচনার কথা বলে, তবুও সে ঠিক করে ফেলে, সেই যুবকটিকে এখন থেকে লুকিয়ে আলাদা করে মোটা করে কাটা চাপের টুকরো গুঁজে দেবার কথা। থার্ড রাইখের আমলের কিছু সৎকাজের মত এটিও একটা সাংঘাতিক কঠিন আর বিপজ্জনক কাজের মধ্যে পড়ত। একাজ করবার সময়ে তার নিজের ভাইও শত্রুদের দলে পড়ত, আবার যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারেও কেমন নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না। এসব সত্ত্বেও কাজটা করে যাচ্ছিল। তবে এ কাজ চালিয়ে যাবার সময় সে জানতে পেরে গেছিল, বন্দীরা সত্যি সত্যিই পালিয়ে যাবার মতলবে ছিল। তাদের বিপদ দিনে দিনে বেড়েই চলেছিল, ক্রমশ পিছু হটে আসা রেড আর্মির লোকেরা তাদের পশ্চিম দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে কিম্বা স্রেফ শেষ করে ফেলবে। চাষী-বৌ সেই যুবক বন্দীর ভাঙা ভাঙা জর্মন ভাষায় প্রকাশ করা ইচ্ছা তার বিশেষ হাত-পা-নাড়ার সাহায্যে ত্যাগ করতে পারল না, সেই অদ্ভুত ঘটনার ফলে তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, অগত্যা তাদের পালিয়ে যাবার পরিকল্পনায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলল। একটা কোট আর একটা বড় লোহা কাটবার কাঁচি সে যোগাড় করল। অবাক কাণ্ড, সেই থেকে সেই মুখ পাল্টে যাবার ঘটনা আর ঘটেনি; চাষী-বৌ তখন শুধু একজন বিদেশী যুবককে সাহায্য করে চলেছে। তাই যখন ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের এক সকালে তার জানলায় টোকা দেবার শব্দ হল আর সেই জানলার কাচে ভোরের আলোয় তার ছেলের মুখটা দেখতে পেল, তখন সে বেশ আঘাত পেল। এবার এটা তার ছেলের মুখ। তার পরনে এস-এস-

দলের ছেঁড়া ইউনিফর্ম, তার দলের সবাই শেষ হয়ে গেছে আর সে উত্তেজিত ভাবে খবর দিল, রাশিয়ানরা সেই গ্রাম থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে রয়েছে। তার এই বাড়ী ফেরার খবর যেন অতি অবশ্য গোপন রাখা হয়। ছাদের ঘরের এক কোণে কোর্টমার্শাল গোছের এক বৈঠক বসল, সেখানে চাষী-বৌ, তার ভাই আর তার ছেলে পরামর্শ করে ঠিক করল, সবার আগে যুদ্ধবন্দীদের শেষ করতে হবে, কারণ তারা হয়তো এই এস-এস সৈনিককে দেখে ফেলেছে আর তাছাড়া তাদের সঙ্গে যে ব্যবহার করা হয়েছে তাও বলে দেবার সম্ভাবনা আছে। কাছেই একটা পাথরের খাত আছে। এস-এস-এর লোকটি আর কারো কথা শুনতে রাজী নয়, সে সাব্যস্ত করল, সেই রাত্রে একজন একজন করে যুদ্ধবন্দীকে গোলাবাড়ীর বাইরে ভুলিয়ে এনে শেষ করতে হবে। তারপর মৃতদেহগুলি সেই পাথরের খাতে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিলেই হবে। সন্ধ্যাবেলায় বন্দীদের বেশ খানিকটা করে ব্র্যাণ্ডি খাওয়াতে হবে, তাতে তাদের সন্দেহ হবার কোনো কারণ নেই, ভাই-এর ধারণা, ইদানীং খামারের মজুররা আগে থেকে সাবধান হয়ে বন্দীদের সঙ্গে মেলামেশায় রাশিয়ানদের বন্ধুত্বের ব্যাপারটা পাকা করে রাখবে, যাতে সময়মত কাজে লাগানো যায়। এস-এস-এর লোকটি তার পরিকল্পনার কথা বলতে বলতে হঠাৎ দেখল তার মা কাঁপছে। ওরা দুজনে ঠিক করে ফেলল, এই মাকে কোনো ক্রমেই আর গোলাবাড়ীর কাছাকাছি যেতে দেয়া হবে না। তাই চাষী-বৌ আতঙ্কিত ভাবে রাতের অপেক্ষায় রইল। মনে হল রাশিয়ানরা খুশী মনেই ব্র্যাণ্ডি খেল, চাষী-বৌ তাদের মাতাল হয়ে একসঙ্গে করুণ গান গাইতে শুনল। কিন্তু যখন তার ছেলে এগারোটা নাগাদ গোলাবাড়ীতে গেল, তখন বন্দীরা সবাই পালিয়ে গেছে। ওরা মাতলামির ভান করছিল। খামার বাড়ীতে এই নতুন অস্বাভাবিক দরদে তারা বুঝতে পেরে গেছিল, রাশিয়ান সৈন্যরা নিশ্চয় খুব কাছাকাছি এসে গেছে। রাশিয়ানরা অর্ধেক রাত পার হলে এসে পৌঁছোয়। ছেলে মাতাল অবস্থায় ছাদের ঘরে পড়ে, চাষী-বৌ ওদিকে ভয়ে এস-এস-ইউনিফর্মটা পুড়িয়ে ফেলতে ব্যস্ত। তার ভাইও মাতাল। তাই চাষী-বৌকেই রাশিয়ান সৈন্যদের আপ্যায়ন আর তাদের খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করতে হল। সে কাজ করে গেল পাথরের মত নিরেট মুখে। রাশিয়ানরা সকালে চলে গেল, রেড আর্মি এগিয়ে চলল। ছেলে, তখনো নেশার ঘোর কাটেনি, আরো ব্র্যাণ্ডি চাইল

আর জানাল, সে ঠিক করে ফেলেছে, জর্মন সৈন্যরা যেখানে পিছু হটছে, তাদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অর্থ এখন যে অবশ্যম্ভাবী পতন, সেকথা বোঝাবার চেষ্টা চাষী-বৌ করল না। কি করবে বুঝতে না পেরে সে পথ আটকে দাঁড়াল, চেষ্টা করল গায়ের জোরে আটকে রাখতে। ছেলে তাকে ধাক্কা দিয়ে খড়ের গাদায় ফেলে দিল। উঠে দাঁড়াবার সময় চাষী-বৌ হাতের কাছে কাঠের একটা ডাণ্ডা পেল, সেটা দিয়ে সে সেই উন্মাদকে আঘাত করল।

সেইদিন সকালেই এক চাষী-বৌ একটা গাড়ী নিয়ে পাশের হাটের জায়গায় রাশিয়ান কম্যাণ্ডার-এর কাছে গিয়ে হাজির হল, তার হাতে বলদের দড়ি দিয়ে বাঁধা তার ছেলেকে সে যুদ্ধবন্দী বলে তুলে দিল আর ছেলেটা যাতে বেঁচে থাকতে পারে সেই অনুরোধ বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করল একজন দোভাষীর কাছে।

এক্সপেরিমেন্ট

মহান ফ্রান্সিস বেকন-এর সাধারণ জীবনটা অপমানজনক সস্তা চলতি কথায় শেষ হয়েছিল: "অপকর্মের ফল শুভ হয় না।" দেশের প্রধান বিচারপতি থাকা কালে তাঁকে ঘুষ নেওয়ার দায়ে অভিযুক্ত করা হয় এবং কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তাঁর লর্ড থাকাকালীন সময়টা যাবতীয় দণ্ড বিধান, ক্ষতিকারক মনোপলির মঞ্জুরি, বেআইনী গ্রেপ্তারের আদেশ এবং প্রভাবিত রায় দান ইংরেজদের ইতিহাসের সবচেয়ে কুৎসিত এবং কলঙ্কময় অধ্যায়। তাঁর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পাওয়ার পর এবং তাঁর স্বীকারোক্তির পর তিনি মানবতাবাদী এবং দার্শনিক হিসাবে বিশ্বখ্যাতি লাভ করেন। তাঁর অপরাধও সাম্রাজ্যের বাইরে বহুদূর অবধি জানাজানি হয়।

তাঁকে কয়েদ থেকে মুক্তি দেবার পর যখন তিনি তাঁর গ্রামের বাড়ীতে ফিরে এলেন তখন তাঁর বয়স হয়েছে। অপরের ক্ষতি করবার জন্য পরিশ্রমের ফলে এবং অন্যেরা তাঁর ক্ষতি করবার জন্য যা করেছিল তার ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু বাড়ীতে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই তিনি প্রকৃতি বিজ্ঞান নিয়ে গভীর অধ্যবসায় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর মানুষের ওপর প্রভুত্ব করার চেষ্টা বিফল হয়েছিল। তাঁর অবশিষ্ট শক্তি উৎসর্গ করলেন, মানুষ কিভাবে প্রাকৃতিক শক্তিকে সবচেয়ে ভাল ভাবে নিয়োগ করতে পারে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। তাঁর গবেষণার কাজ প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য উৎসর্গ করার ফলে প্রায়ই তাঁকে পড়বার ঘর ছেড়ে মাঠে-ঘাটে, বাগানে আর আস্তাবলে যেতে হত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি মালীদের সঙ্গে কথা বলতেন, ফলের গাছগুলির উন্নতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে, কিম্বা গয়লা মেয়েদের নির্দেশ দিতেন, প্রতিটি গরুর দুধ কিভাবে মাপা সম্ভব। এসব করতে গিয়ে আস্তাবলের একটা ছোকরা তাঁর নজরে পড়ে। একটা খুব ভাল ঘোড়া অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, সেই ছোকরা দিনে দুবার করে দার্শনিকের কাছে তার বিবৃতি দিত। ছেলেটির উৎসাহ এবং নজর করার ক্ষমতা বৃদ্ধকে আকৃষ্ট করে।

যাই হোক একদিন সন্ধ্যাবেলায় যখন তিনি আস্তাবলে গেছেন, দেখেন এক বৃদ্ধা ছেলেটির পাশে দাঁড়িয়ে। বৃদ্ধা বলছিল: "লোকটা খারাপ, সাবধানে থাকিস। মস্ত মানুষ হতে পারে, বিশাল বড়লোক হতে পারে, তবু লোকটা তো খারাপ। তোর পেট চালাতে হবে, কাজেই কাজকর্ম ঠিকমত করবি, তবে মনে রাখবি, লোকটা খারাপ।"

দার্শনিক ছোকরাটির উত্তর আর শোনেন নি, কারণ তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে গেছিলেন, তবে পরদিন সকালে ছেলেটির মধ্যে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন না।

ঘোড়াটা আবার সুস্থ হয়ে উঠলে তিনি ছোকরাটিকে তাঁর সঙ্গে এদিকে ওদিকে যেতে দিতেন আর তাকে ছোটখাট কাজের ভার দিতেন। আস্তে আস্তে তার সঙ্গে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে কথা বলবার অভ্যাস হয়ে গেল তাঁর। সেইসব কথা বলবার সময় কিন্তু কোনোক্রমেই এমন শব্দ ব্যবহার করতেন না, যেমন পরিণত বয়সের লোকেরা শিশুদের উপযুক্ত ভাষা ব্যবহার করে থাকে সাধারণত। কথা বলতেন, যেন একজন শিক্ষিত লোকের সঙ্গে বলছেন। তাঁর সারাজীবন কেটেছে মস্তবড় সব পণ্ডিতদের সঙ্গে আর তাঁকে তারা কদাচিৎ বুঝতে পেরেছে। তার কারণ এমন নয় যে তাঁর বক্তব্য অস্পষ্ট ছিল, বরং তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। কাজেই ছেলেটার অসুবিধার কথা চিন্তা করতেন না, তবে বিদেশী শব্দ ব্যবহার করে ফেললে সেটা সংশোধন করে নিতেন ধৈর্যের সঙ্গে। ছেলেটির প্রধান কাজ ছিল, সে যেসব জিনিস দেখছে এবং যেসব কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকছে, সেই সমস্ত কিছুর বিবরণ দেওয়া। দার্শনিক তাকে দেখিয়ে দিতেন, কত শব্দ আছে আর কত শব্দ প্রয়োজন যার সাহায্যে কোনো বস্তুর বিবরণ দেওয়া সম্ভব যাতে সেটা অর্থেক বোঝা যায় এবং বিশেষ করে সেই বিবরণের সাহায্যে কর্তব্য স্থির করা যায়। এমন কিছু শব্দও আছে যা ব্যবহার না করাই ভাল, কারণ সেসব শব্দ প্রকৃতপক্ষে কিছুই বলে না। 'ভাল', 'মন্দ', 'সুন্দর', এইসব শব্দ। ছেলেটি খুব শিগগীর বুঝতে পারল একটা পোকাকে 'কুৎসিত' বলার তেমন কোনো মানে হয় না। এমন কি 'দ্রুত' শব্দটাও যথেষ্ট নয়। বলা দরকার, একই আকৃতির আর সব সৃষ্টির তুলনায় সেটি কত দ্রুত চলে এবং কিভাবে তা সম্ভব হয়। সেটিকে একটা খাড়া ঢালের ওপর এবং একটা মসৃণ

তলের ওপর রাখতে হবে আর এমন শব্দ করতে হবে যাতে ওটা দৌড়ে পালায়, কিম্বা ওটার জন্য সামান্য খাদ্য রাখতে হবে যাতে ওটা এগিয়ে যেতে পারে। যথেষ্ট সময় ওটার জন্য দিলে ওটা 'দ্রুত' তার কার্যতা হারিয়ে ফেলে।

একবার ছেলেটির হাতে একটা রুটি ছিল, এমন সময়ে দার্শনিক এলেন তার সামনে, তখন তাকে রুটিটার বিবরণ দিতে হয়েছিল।

"এক্ষেত্রে তুমি অনায়াসে 'ভাল' শব্দটা ব্যবহার করতে পার", বৃদ্ধ বললেন, "কারণ রুটি মানুষের খাদ্য হিসাবে তৈরী করা হয়েছে এবং মানুষের কাছে সেটা ভাল বা মন্দ হতে পারে। একমাত্র বড় বড় বস্তুর বেলায়, যেসব বস্তু প্রকৃতির সৃষ্টি এবং যেসব বস্তু কোনোক্রমেই বিশেষ প্রয়োজনে সৃষ্ট নয় এবং বিশেষ করে যেসব বস্তু কেবলমাত্র মানুষের ব্যবহারের জন্য নয়, সেইসব বস্তুর বেলায় ওসব শব্দ ব্যবহার করা বোকামি।"

বিলেত সম্বন্ধে বলা তার ঠাকুমার কথাগুলি ছেলেটির মনে পড়ল।

যেহেতু সবকিছু সবসময়ে সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা করা যায় এমনি হওয়ার দরুণ ছেলেটির কল্পনাশক্তির দ্রুত উন্নতি হতে থাকল, যেমন একটা ঘোড়া কোনো জিনিস ব্যবহার করার ফলে সুস্থ হয়ে ওঠে কিম্বা একটা গাছ তেমন কোনো জিনিস ব্যবহার করলে মরে যায়। সে আরো বুঝল যে সব সময়ে একটা যুক্তিসম্মত দ্বিধা থেকেই যায়। হয়তো লক্ষ্যণীয় পরিবর্তনগুলির জন্য দায়ী প্রকৃতপক্ষে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেগুলোই। জ্ঞানী বেকন-এর চিন্তাধারার বৈজ্ঞানিক অর্থ ছেলেটি বলতে গেলে কিছুই বুঝত না। কিন্তু সেই সমস্ত কাজের সুস্পষ্ট উপযোগিতা তাকে খুবই উৎসাহিত করত।

সেই দার্শনিকের ব্যাপারে সে বুঝেছিল : পৃথিবীতে একটা নতুন যুগের সূচনা হচ্ছে। বলতে গেলে মানুষ তার জ্ঞান প্রত্যেকদিন বাড়াচ্ছে। আর যাবতীয় জ্ঞানের অর্থ পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য এবং তৃপ্তির বৃদ্ধি। বিজ্ঞান পথ দেখাচ্ছে। বিজ্ঞান পরীক্ষা করছে মহাবিশ্বকে, এই পৃথিবীতে যা আছে সব কিছু— উদ্ভিদ, প্রাণী, জল, ফল, বাতাস, সবকিছু ; যার ফলে সেসব কিছু থেকে আরো উপকার পাওয়া যায়। মানুষের ধারণা আসলে গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মানুষের জ্ঞান। মানুষের ধারণা মাত্রাহীন আর জ্ঞান অত্যন্ত কম। সেইজন্য সব কিছু যাচাই করে দেখবার প্রয়োজন, নিজে, হাতে করে আর নিজের চোখে দেখা সম্পর্কে কথায় এবং তা কোনো রকম প্রয়োজনে আসতে পারায়।

তাই ছিল নতুন বিদ্যা, এবং ক্রমশ বেশী সংখ্যক লোক এই কাজে ব্যস্ত হচ্ছিল, নতুন কাজ করবার জন্য প্রস্তুত এবং সেজন্য উৎসাহী।

এ ব্যাপারে বই-এর স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যদিও অনেক বই-ই বাজে। ছেলেটি বেশ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল, যারা নতুন কাজ হাতে নিচ্ছে তাদের একজন হতে হলে তাকে বই-এর সাহায্য নিতেই হবে।

একথা ঠিক, সে ঐ বাড়ীর লাইব্রেরীতে কোনদিন ঢুকতে পারেনি। আস্তাবলের সামনে নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করা ছিল তার কাজ। যদি সেই বৃদ্ধ কয়েকদিন না আসত তাহলে সে বড় জোর একবার বাগানে গিয়ে দেখা করবার সুযোগ পেত। যাই হোক, প্রত্যেক রাতেই যতক্ষণ আলো জ্বলত, পড়বার ঘর সম্বন্ধে তার কৌতূহল বেড়েই চলত। সেই ঘরের উল্টো দিকের একটা ঝোপের ওপর উঠে সে বই-এর আলমারীর সারিগুলো দেখতে পেত।

সে ঠিক করল, পড়া শিখতে হবে।

সেটা অবশ্যই সহজ কাজ নয়। পাদ্রী সাহেবের কাছে গিয়ে যখন সে তার মনের ইচ্ছা প্রকাশ করল, তখন তিনি ওর দিকে এমনভাবে তাকালেন, যেন খাবার টেবিলে একটা মাকড়সা দেখছেন।

বিরক্ত হয়ে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, "গরুগুলোকে বুঝি ঈশ্বরের বাণী পড়ে শোনাতে চাস?" থাপ্পড় না খেয়ে সেখান থেকে চলে আসতে পেরেই ছেলেটি খুশী।

কাজেই তাকে অন্য পথ ধরতে হল।

গ্রামের গীর্জার বেদীতে একটা নিত্য-কর্ম-পদ্ধতির বই থাকত। সেটা সবাই পড়তে পারত, সেজন্য গীর্জার ঘণ্টার দড়িটা টেনে জানান দিতে হত। এখন যদি জানা যেত, পাদ্রী সাহেব প্রার্থনা সভায় কোন জায়গা থেকে গেয়ে শোনাচ্ছেন, তাহলে শব্দ আর অক্ষরগুলোর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বার করা সম্ভব হতো। যাই হোক, ছেলেটি পাদ্রী সাহেবের গাওয়া গানগুলো মুখস্থ করতে শুরু করল, অন্তত পক্ষে তার কিছু কিছু। পাদ্রী সাহেব অবশ্য শব্দগুলো বিশ্রীভাবে অস্পষ্ট উচ্চারণ করতেন, আর সেই নিত্য-কর্ম-পদ্ধতি তেমন নিয়মিত ভাবে পড়তেন না।

তবুও ছেলেটি কিছুদিন পরে পাদ্রী সাহেবের কয়েকটা গানের শুরুটা গাইতে শিখে গেল। একদিন যখন সে সেইসব অভ্যাস করছে গোলাবাড়ীর পেছনে বসে তখন আস্তাবলের ভার যার ওপর তার কাছে ধরা পড়ে গেল,

ফলে বারও যেল। লোকটা ভেবেছিল, ছেলেটা পাদ্রী সাহেবকে নিয়ে তামাশা করছে। এইভাবে তাহলে খাপ্পড়টি অবশেষে খেল ছেলেটি।

পাদ্রী সাহেব কোন জায়গা থেকে পেয়ে শোনাচ্ছেন, সেটা বার করা, অর্থাৎ সঠিক শব্দগুলো কোথায় লেখা আছে সেটাও ছেলেটির পক্ষে খুঁজে বার করা সম্ভব হল না। এমন সময়ে একটা ভীষণ অঘটন ঘটে গেল। যার ফলে তার পড়তে শেখার চেষ্টায় প্রথমে ছেদ পড়ল। মিলর্ড অসুস্থ হয়ে পড়লেন, মৃত্যু অবধারিত।

তিনি পুরো হেমন্ত কালটা অসুস্থ রইলেন, শীতকালেও কোনো উন্নতি হল না। সেই অবস্থায় তিনি খোলা গাড়ীতে চেপে বেশ কয়েক মাইল দূরের এক খামারবাড়ীতে গেলেন। ছেলেটি সঙ্গে যাবার সুযোগ পেয়েছিল। গাড়ীর পেছন দিকের তক্তার ওপর দাঁড়িয়ে সে গেল।

দেখা সাক্ষাত করা শেষ হল, বৃদ্ধ তাঁর আপ্যায়নকারীর সঙ্গে কোনো মতে গাড়ীতে ফিরে এলেন, পথে একটা ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া চড়াই পাখি দেখতে পেয়ে হাতের ছড়িটা দিয়ে সেটাকে উল্টে দিলেন।

"আপনার কী মনে হয়, কতদিন এটা এখানে পড়ে আছে?" প্রশ্নটা করা হয়েছিল সেই খামারের মালিককে। ছেলেটি গরম জলের বোতল নিয়ে পেছন পেছন আসবার সময় তা শুনল। উত্তর হয়েছিল: "এক ঘণ্টা আগে থেকে কিম্বা এক সপ্তাহ হল, কিম্বা তার চেয়েও বেশী।" বেঁটে বৃদ্ধ লোকটি চিন্তিত-ভাবে এগিয়ে চললেন, তারপর তাঁর আপ্যায়নকারীর কাছ থেকে বেশ অন্যমনস্কভাবে বিদায় নিলেন।

গাড়ীটা জোড়া হলে ছেলেটির দিকে ঘুরে তিনি বললেন, "ডিক্, মাংসটা এখনো বেশ তাজা আছে।"

বরফ ঢাকা মাঠগুলোর ওপর সন্ধ্যা নেমে আসছিল আর ঠাণ্ডাও বাড়ছিল দ্রুত, তাই তারা পথটা রীতিমত জোর ছুটে পার হয়। তার ফলে খামার-বাড়ীর ভেতরে ঢোকবার বাঁক নেবার সময় একটা মোরগ চাপা পড়ে, ওটা বোধহয় মুরগীর ঘর থেকে পালিয়ে এসেছিল। বৃদ্ধ লোকটি লক্ষ্য করেছিলেন কোচওয়ান হঠাৎ উড়ে আসা মোরগটাকে বাঁচাবার চেষ্টায় গাড়ীটাকে ঘোরাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল, তখন তিনি ইশারা করলেন গাড়ী থামাতে।

কম্বল, চাদর এসবের ভেতর থেকে বেরিয়ে তিনি গাড়ী থেকে নামলেন,

ছেলেটির কাঁধে ভর দিয়ে যেখানে মোরগটা পড়েছিল সেখানে গেলেন, কোচওয়ান বাইরের ঠাণ্ডার কথা বললেও তা গ্রাহ্য করলেন না।

মোরগটা মরে গেছে।

বৃদ্ধ বললেন ওটাকে তুলতে।

"নাড়ি-ভুঁড়ি সব বার করে ফেল", হুকুম করলেন।

কোচওয়ান বলল, "ওটা রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে করলে হতো না!" তার ওকথা বলার কারণ, তাদের মালিক সেই ঠাণ্ডা হাওয়ায় প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছিলেন সেটা সে লক্ষ্য করেছিল।

"না, এখানে করাই ভাল", তিনি বললেন, "ডিক্‌-এর কাছে নিশ্চয় একটা ছুরি আছে, আর আমাদের বরফ দরকার।"

ছেলেটি আদেশ অনুসারে কাজ করল, আর সেই বৃদ্ধ, মনে হল যেন তাঁর অসুস্থতা আর ঠাণ্ডার কথা ভুলে গেছেন, নিজেই ঝুঁকে পড়ে মুঠো মুঠো বরফ নিলেন বহু কষ্টে। যত্ন করে সেই বরফ দিয়ে ভরে দিলেন মোরগটার ভেতরটা।

ছেলেটি বুঝতে পেরে গেছে। সেও বরফ তুলল, তার শিক্ষককে দিল, এমনি করে মোরগটার ভেতরটা সম্পূর্ণভাবে বরফে বোঝাই করা হল।

"এবার এটার ছটার সপ্তাহ তাজা থাকবার কথা", বললেন সেই বৃদ্ধ উত্তেজিত ভাবে, "এটাকে আমাদের বাড়ির নীচের ঘরের পাথরের মেঝের ওপর রেখে দাও!"

ঐ সামান্য পথটুকু হেঁটেই গেলেন, একটু পরিশ্রান্ত আর ছেলেটার কাঁধে বেশ ভর দিয়ে, ছেলেটার বগলতলায় বরফ ঠাসা মোরগ।

হলঘরে ঢুকতেই বাইরের সেই ঠাণ্ডার প্রভাবে তিনি কাঁপতে শুরু করলেন।

পরদিন সকালে প্রচণ্ড জ্বরে বিছানা নিলেন।

ছেলেটি চিন্তিতভাবে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করত, চেষ্টা করত তার শিক্ষকের অবস্থার কথা জানতে। সে সামান্যই জানতে পারল, সেই বিশাল খামারবাড়ীর সাধারণ জীবনে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল না। অবশেষে তৃতীয় দিনে একটা ঘটনা ঘটল। তাকে পড়বার ঘরে ডেকে পাঠানো হল।

সরু একটা তক্তাপোষের ওপর অনেকগুলো কম্বল চাপা দেওয়া অবস্থায় বৃদ্ধ শুয়ে, তবে জানালাগুলো খোলা, ফলে ভেতরটা ঠাণ্ডা। তা সত্ত্বেও রোগীকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। তিনি কাঁপা কাঁপা স্বরে বরফ ঠাসা মোরগটার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

ছেলেটি জানাল, ওটা তাজা দেখাচ্ছে, কোনো পরিবর্তন হয়নি।

"খবর শুভ", বললেন বৃদ্ধ সন্তুষ্টভাবে। "দুদিন পরে এসে আবার খবর দিয়ে যেও!"

চলে আসবার সময় ছেলেটার দুঃখ হচ্ছিল মোরগটা সঙ্গে করে নিয়ে যায়নি বলে। চাকর-বাকরদের মহলে যতটা শোনা গেছিল, বৃদ্ধ লোকটিকে দেখে ততটা অসুস্থ মনে হল না।

ছেলেটি দিনে দুবার করে নতুন করে বরফ ঠাসতে শুরু করল মোরগটার পেটে, আর ছেলেটা আবার যখন রোগীর ঘরের দিকে রওনা হলো তখনো মোরগটা টাট্‌কা অবস্থা একটুও হারায় নি।

ছেলেটা অস্বাভাবিক বাধা পেল।

শহর থেকে ডাক্তাররা এসেছে। করিডোরে ফিস্‌ফিস্, হুকুম আর তালিমের স্বর, আর সর্বত্র অচেনা মুখ। একটা চাকর মস্ত একটা কাপড় দিয়ে ঢাকা প্লেট নিয়ে যাচ্ছিল রোগীর ঘরের দিকে, সে তাকে ধমকে ভাগিয়ে দিল।

সারাটা সকাল সারাটা বিকেল সে বহুবার বৃথা চেষ্টা করল রোগীর ঘরে পৌঁছবার। মনে হল ঐসব অচেনা ডাক্তারেরা সেই প্রাসাদেই রয়ে যাবার চেষ্টা করছে। ওদের দেখে ছেলেটার মনে হচ্ছিল যেন সব বিশাল বিশাল কালো পাখি, তারা একজন রোগীর ওপর চেপে বসেছে, বেচারী রোগী অসহায়। সন্ধ্যের দিকে সে করিডোরের একটা ছোট আলমারির মধ্যে লুকিয়ে রইল, ভেতরটা খুব ঠাণ্ডা। শীতে কাঁপতে থাকল সমানে, তার মনে হল সেটা একদিক দিয়ে ভাল, কারণ এক্সপেরিমেন্ট-এর খাতিরে মোরগটাকে অতি অবশ্য ঠাণ্ডার মধ্যে রাখার দরকার।

রাতের খাবারের সময় কালো বন্যায় ভাটা পড়ল খানিকটা, ছেলেটি চুপিসারে রোগীর ঘরে ঢুকে পড়বার সুযোগ পেল।

রোগী একা শুয়ে, সবাই খেতে গেছে। ছোট্ট বিছানাটার পাশে একটা পড়বার আলো দাঁড় করানো, সেটায় সবুজ ঢাকনা দেওয়া। বৃদ্ধ লোকটির মুখটা অদ্ভুত শুকনো, মনে হচ্ছিল মোমের মত সাদা। চোখ দুটো বোজা, কিন্তু হাত দুটো অস্থিরভাবে চাদরের ওপর নড়ছিল। ঘরটা খুব গরম, জানালাগুলো সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ছেলেটা বিছানার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল, বিকারগ্রস্তের মত মোরগটা এগিয়ে ধরা, তারপর হাল্কা স্বরে অনেকবার বলল, "মিলর্ড"। কোনো

উত্তর পেল না। তার মনে হল না, রোগী ঘুমোচ্ছেন, কারণ ঠোঁট দুটো নড়ছিল যেন কথা বলছেন।

ছেলেটা ঠিক করল, তাঁর নজরে আসতে হবে, কারণ এক্সপেরিমেন্ট-এর জন্য আর যা করতে হবে তার প্রয়োজনীয়তা সে বিশেষভাবে বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু কমলের ঢাকনার কাছে পৌঁছুবার আগেই—(ঝুড়ির মধ্যে বন্ধ করে রাখা মোরগটা একটা চেয়ারের ওপর রেখে দিতে হয়েছিল) টের পেল, কে যেন তাকে পেছন থেকে ধরে টেনে সরিয়ে আনল। অন্ধকার মুখওয়ালা একটা মোটা লোক তার দিকে তাকিয়ে আছে একটা খুনীর মত। ছেলেটা বেগতিক দেখে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এক ছুটে ঝুড়িটা নিয়ে দরজা দিয়ে বাইরে পালাল।

করিডোরে এসে মনে হল, ছোট বাটলার সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসবার সময় তাকে বুঝি দেখে ফেলেছে। সেটা মুস্কিলের কথা। ও কি করে প্রমাণ করবে, একটা জরুরী এক্সপেরিমেন্ট চালাবার জন্য মিলর্ড-এর হুকুম মতই সে ওখানে গেছিল? বৃদ্ধ লোকটি সম্পূর্ণভাবে ডাক্তারদের কবলে, তাঁর ঘরের বন্ধ জানালাগুলোই তার প্রমাণ।

সে সত্যিই দেখল, একজন চাকর চত্বর পার হয়ে আস্তাবলের দিকে গেল। তাই রাতের খাওয়ার চিন্তা ত্যাগ করতে হল, মোরগটাকে মাটির নীচের ঘরে রেখে এসে, বিচালি গাদায় গিয়ে ঢুকল গুড়ি মেরে।

তার মাথায় ঘুরছে সেই পরীক্ষার কথা, ফলে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারল না। খুব ভয়ে ভয়ে সে তার লুকোনোর জায়গা থেকে বের হল পরদিন সকালে।

কেউই ওর ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছিল না। সেই বিশাল বাড়ীতে এক জঘন্য টানাপোড়েন চলছে। মিলর্ড সকালের দিকে মারা গেছেন।

ছেলেটা সারাটা দিন ঘুরে বেড়াল, যেন মাথায় আঘাত পেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। তার মনে হচ্ছিল, তার শিক্ষকের এই বিয়োগযন্ত্রণা সে কখনো ভুলতে পারবে না।

বিকেল গড়িয়ে গেলে সে যখন এক গামলা বরফ নিয়ে মাটির নীচের ঘরে গেল তখন তার দুশ্চিন্তা দাঁড়াল শেষ না-করা সেই এক্সপেরিমেন্টর-এর দুশ্চিন্তায়, তখন চোখের জলে ঝুড়িটা ভাসিয়ে দিল। এই বিশাল আবিষ্কারের কী হবে?

সেই বিশাল বাড়ীতে ফিরে যাবার সময় তার পা দুটো এত ভারী মনে

হল যে সে ফিরে বরফের ওপর তার পায়ের ছাপ লক্ষ্য করে দেখল, ওগুলো আগের চেয়ে বেশী গভীর কিনা—, ফিরে জানতে পারল লণ্ডন-এর ডাক্তাররা তখনো ফিরে যায়নি। তাদের গাড়ীগুলো তখনো সেখানে রয়েছে।

তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে ঠিক করল, ওদের কাছে সেই আবিষ্কারের কথা বলবে। তারা সব পণ্ডিত লোক, কাজেই সেই এক্সপেরিমেন্ট-এর গুরুত্ব ঠিকই বুঝবে। সে বরফে জমানো মোরগ সমেত ছোট ঝুড়িটা নিয়ে এল তারপর গিয়ে দাঁড়াল ইঁদারার পেছনে, লুকিয়ে রইল যতক্ষণ না ঐ ভদ্রলোকদের একজন, দেখলে তেমন ভয় লাগে না এমন একজন ছোটখাট লোক এগিয়ে এল। এগিয়ে গিয়ে সে তার ঝুড়িটা এগিয়ে ধরল। প্রথমে তার গলার স্বর আটকে গেল, তারপর অবশ্য ভাঙা-ভাঙা কথায় তার বক্তব্য পেশ করতে পারল।

"ছ'দিন আগে মিলর্ড এটাকে মরা অবস্থায় পান—এক্সেলেন্স, আমরা এটার পেটের মধ্যে বরফ দিয়ে রেখেছি। মিলর্ড-এর ধারণা ছিল, এটা তাজা থাকবে। নিজেই দেখুন! এটা একদম তাজা রয়ে গেছে।"

ছোটখাট লোকটি অবাক হয়ে ঝুড়ির দিকে তাকিয়ে রইল।

"বেশ তো, তারপর?" জিজ্ঞাসা করল।

"এটা নষ্ট হয়নি", ছেলেটি বলল।

"আচ্ছা", বলল সেই লোকটি।

"নিজেই দেখুন না", বলল ছেলেটি ব্যস্ত ভাবে।

"দেখছি", বলল সেই ছোটখাট লোকটি, তারপর মাথা নাড়ল। মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেল।

ছেলেটি হতাশ ভাবে তার যাওয়া দেখল। এই ছোটখাট লোকটাকে সে বুঝে উঠতে পারল না। সেই ঠাণ্ডার মধ্যে গাড়ী থেকে নেমে সেই বৃদ্ধ লোকটি এই এক্সপেরিমেন্ট শুরু করেননি, আর তার ফলেই নিজের মৃত্যুকে ডেকে আনেননি? নিজের হাতে তিনি মাটির ওপর থেকে বরফ তুলেছিলেন। সেটা ঘটনা।

সে আস্তে আস্তে বাটির নিচের ঘরের দরজার দিকে রওনা হল, দরজার কাছাকাছি গিয়ে কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর চট্ করে ঘুরে রসুইখানার দিকে ছুট দিল।

সেখানে রাঁধুনী লোকটাকে বেশ ব্যস্ত দেখল, রাতের খাওয়ার সময় আশপাশের অঞ্চল থেকে অনেক লোক আসবে আশা করা হচ্ছিল।

"ওই পাখিটা আবার আনলি কেন?" বিরক্ত ভাবে খিঁচিয়ে উঠল রাঁধুনী। "এটা দেখছি জমে একদম বরফ হয়ে গেছে!"

"তাতে কিছু ক্ষতি নেই", ছেলেটি বলল, "মিনতি বলছেন, তাতে কিছু ক্ষতি হবে না।"

রাঁধুনী ওর দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল অন্যমনস্কভাবে, তারপর ব্যস্তভাবে বড় ফ্রাইং প্যানটা হাতে দরজার দিকে এগিয়ে গেল, কিছু একটা ফেলে দিতে বোধহয়।

ছেলেটা ঝুড়ি সমেত তার পেছন পেছন গেল, নাছোড়বান্দা।

"একবার চেষ্টা করে দেখলে হয় না?" জিজ্ঞেস করল মিনতি ভরা স্বরে।

রাঁধুনীর ধৈর্য আর কুলোল না। তার মোটা মোটা হাতদুটো দিয়ে মোরগটা তুলে নিয়ে এক ঝটকায় ছুঁড়ে ফেলে দিল উঠানের ওপর।

"তোর মাথায় আর কিছু আসছে না?" হুংকার দিয়ে উঠল দিক্-বিদিক জ্ঞান হারিয়ে, "এদিকে ছিক লর্ডশিপ মারা গেছেন।"

মূকভাবে ছেলেটি মোরগটা তুলে নিল মাটির ওপর থেকে তারপর সেটা নিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল।

পরের দুটো দিন সমাধির আয়োজনে কেটে গেল। ছেলেটাকে ঘোড়ার গাড়ী জোড়া আর ঘোড়া আলগা করায় খুব ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। অনেক সময় চোখ খোলা অবস্থাতেই ঘুমিয়েছে। তারই মধ্যে ঝুড়িতে টাটকা বরফ ফেলেছে। তার কাছে সবই অর্থহীন মনে হল, নতুন যুগ শেষ।

কিন্তু তৃতীয় দিনে, যেদিন শেষকৃত্য হবে, সেদিন স্নান করে সবচেয়ে ভাল পোশাক পরবার পর তার উৎসাহ একটুও কমেছে বলে মনে হল না। সুন্দর রোদ্দুরে ভরা শীতকাল, গ্রামের গীর্জার ঘণ্টার শব্দ।

নতুন আশায় ভরপুর হয়ে সে মাটির নিচের ঘরে গেল, মরা মোরগটাকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল অনেকক্ষণ ধরে। ওটার মধ্যে পচে ওঠার কোনো লক্ষণ দেখল না। সাবধানে সেটাকে একটা বাক্সের মধ্যে ভরল, সেটাকে পরিষ্কার সাদা বরফ দিয়ে ভরল, তারপর সেটা বগলদাবা করে গ্রামের দিকে রওনা হল।

মনের আনন্দে শিস্ দিতে দিতে সে তার ঠাকুমার নিচু রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। তার বাবা-মা অল্প বয়সে মারা গেছিল বলে ঠাকুমার কাছেই সে বড় হয়েছে আর ঠাকুমার ওপর তার ভরসা খুব।

বাক্সে কি আছে এ। না দেখিয়ে ছেলেটা প্রথমে সেই বুড়ীকে মিলর্ড-এর এক্সপেরিমেন্ট-এর কথা বলল।

ঠাকুমা তখন কবরখানায় যাবার জন্য পোশাক পাল্টাচ্ছিল।

ঠাকুমা ধৈর্য ধরে ওর কথা শুনল।

"কিন্তু সেকথা তো সবাই জানে", সে বলল। "ঠাণ্ডায় জমে যায় আর কিছুদিন ঠিক থাকে। এটা আর নতুন কথা কী?"

"আমার মনে হয়, ওটা খাওয়া যায়", বলল ছেলেটা আর চেষ্টা করল যতটা সম্ভব উদাসীন থাকতে।

"এক সপ্তাহ আগে মরা একটা মোরগ খাওয়া? ওটাতো বিষ!"

"কেন? ওটা যদি আগের মতই থাকে, মরার সময় যেমন ছিল? তাছাড়া ওটা মিলর্ড-এর কোচওয়ান মেরে ফেলেছিল, তার মানে অসুস্থ ছিল না।"

"কিন্তু ভেতরে ভেতরে, ভেতরে ভেতরে ওটা পচে গেছে!" বুড়ী বলল, একটু অধৈর্য হয়ে উঠছে।

"আমার মনে হয়না", ছেলেটি বলল জোর দিয়ে, তার পরিষ্কার দৃষ্টি মোরগটার ওপর। "ভেতরে তো সারাটা সময় বরফ ছিল। ভাবছি ওটা রান্না করব।"

বুড়ী বিরক্ত হয়ে উঠল।

"তুই আমার সঙ্গে কবরখানায় যাবি", বলল ও-প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে। "হিজ্ লর্ডশিপ তোর জন্য অনেক করেছেন বলে আমার ধারণা, তাই তোকে ভদ্রভাবে তাঁর কফিনের পেছন পেছন যেতে হবে।"

ছেলেটা তার কথায় উত্তর দিল না। বুড়ী যখন কালো উলের মাফ্লার মাথায় জড়াচ্ছে, তখন সে বরফের ভেতর থেকে মোরগটা বার করল, ফুঁ দিয়ে সব বরফ উড়িয়ে দিল, তারপর সেটাকে উনুনের সামনে দুটো কাঠের ওপর রাখল। সবটা বরফ ঝরিয়ে ফেলতে হবে।

বুড়ী তার দিকে আর তাকায়নি। নিজে তৈরী হয়ে ছেলেটার হাত ধরল তারপর তাকে কোনো সুযোগ না দিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বেশ খানিকটা পথ ছেলেটি অনুগতের মত সঙ্গে গেল। আরো অনেক লোক তখন পথে, সবাই চলেছে কবরখানার দিকে, অনেক পুরুষ আর মেয়ে। হঠাৎ ছেলেটা ব্যথায় চিৎকার করে উঠল। তার একটা পা বরফের খাঁজে আটকে গেছে। মুখ বিকৃত করে সে সেটা টেনে বার করল, খোঁড়াতে

খোঁড়াতে মাঠের ওপর পড়ে থাকা একটা পাথরের কাছে গিয়ে তার ওপর বসল, সেখানে বসে পায়ে হাত ঘষতে থাকল।

"বেকায়দায় পা পড়েছিল", বলল ছেলেটি।

বুড়ী ওকে দেখল সন্দেহের চোখে।

"কিন্তু তুই তো হাঁটতে পারবি", বলল।

"না", বলল ছেলেটি বিড়বিড় করে। "তবে বিশ্বাস না হয়, বস আমার পাশে, যতক্ষণ ব্যথাটা না কমে।"

বুড়ী কোনো কথা না বলে বসল ওর পাশে।

পনেরো মিনিট কেটে গেল। তখনো গ্রামের লোকেরা আসছে, তবে অবশ্যই সংখ্যায় ক্রমশ কম। ওরা দুজন বসে রইল জেদ করে রাস্তার ধারে।

তারপর বুড়ী বলল গম্ভীর ভাবে:

"উনি তোকে শেখাননি যে মিথ্যে বলতে নেই?"

ছেলেটা কোনো উত্তর দিল না। বুড়ী নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। তার শীত করছে।

"দশ মিনিটের মধ্যে যদি না আসিস, তাহলে তোর দাদাকে বলে দেব, ও তখন তোকে আচ্ছা করে পেটাবে।"

এইকথা বলে টলতে টলতে রওনা হল, একটু তাড়াতাড়ি, যাতে শেষকৃত্যের সময় বয়ে না যায়।

বুড়ী বেশ খানিকটা পথ এগিয়ে গেলে ছেলেটি ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়াল। সে ফিরে যেতে শুরু করল, তবে তখনো বারে বারে ফিরে দেখছিল আর খোঁড়াচ্ছিল আরো কিছু সময়। যখন একটা ঝোপ তাকে বুড়ীর চোখের আড়াল করল তখন সে আবার স্বাভাবিক ভাবে হাঁটতে শুরু করল।

কুঁড়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে মোরগটার পাশে বসল, অনেক আকাঙ্খা নিয়ে ওটার দিকে দেখল। ওটাকে একটা ডেকচিতে সেদ্ধ করবে তারপর একটা ডানা খাবে। তখন বোঝা যাবে, ওটা বিষাক্ত হয়ে গেছে কিনা।

অনেক দূর থেকে তিনবার কামান দাগার আওয়াজ শোনা গেল। ফ্রান্সিস বেকন, ভেরুলাম-এর ব্যারন, ভাইকাউন্ট সেইন্ট আলবেন, একদা ইংল্যাণ্ডের প্রধান লর্ড চ্যান্সেলর, যিনি তাঁর সমকালীন লোকেদের মধ্যে শুধু যথেষ্ট ঘৃণারই উদ্রেক করেননি, আরো অনেকের মধ্যে বিজ্ঞানের উপকারিতা সম্বন্ধেও উৎসাহ সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁকে সম্মান দেখাবার উদ্দেশ্যে ঐ তোপধ্বনি।

বিদ্রোহী লোকটির ওভারকোট

ব্রোনার সেই লোকটি, যাকে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে রোমের বিচারসভার আমলারা প্রচলিত ধারণার বিরোধিতার দায়ে কাঠের গাদায় পুড়িয়ে মেরেছিল, সেই গিয়োর্ডানো ব্রুনো এমনিতে একজন বিশাল পুরুষ বলে গণ্য। তাঁর পাণ্ডিত্য এবং মহাকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের স্থান পরিবর্তনের সেই তত্ত্ব প্রমাণিত হওয়ার জন্যই শুধু নয়, বিচার-সভার সামনে তাঁর দুঃসাহসী আচরণের জন্যও। ওদের তিনি বলেছিলেন: "তোমাদের এই রায় শুনে আমি যতটা ভয় না পাচ্ছি, তার চেয়ে অনেক বেশী ভয় তোমরা বোধ হয় পাচ্ছ আমার বিরুদ্ধে এই রায় দিতে।" তাঁর লেখাগুলো পড়লে এবং সেইসঙ্গে তাঁর জনসাধারণের সম্মুখীন হবার বিবরণগুলিতে একবার নজর বোলালে, তাঁকে একজন বিশাল পুরুষ বলে মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো গতি থাকে না। তা ছাড়াও একটা গল্প আছে, যা থেকে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আরো হয়তো বাড়তে পারে। সেটি তাঁর ওভারকোটের কাহিনী।

জানা দরকার, কিভাবে তিনি বিচারসভার পাল্লায় পড়েন।

ভেনিসের এক সম্রান্ত ব্যক্তি, নাম মোকেনিগো, একবার সেই পণ্ডিতকে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে, উদ্দেশ্য তাঁর কাছ থেকে প্রকৃতি বিজ্ঞান এবং মনে রাখবার কৌশল জেনে নেওয়া। কয়েক মাস ধরে তাঁর পরিচর্যা করবার পর তার পরিবর্তে সে পেল যুক্তিযুক্ত জ্ঞান। কিন্তু সে আশা করছিল কিছু তুক-তাক শিখে নেবে, তার বদলে পেল শুধু ঐসব প্রকৃতি বিজ্ঞানের তত্ত্ব। তাতে সে বেশ অসন্তুষ্ট হয়েছিল, কারণ ওসব তার কোনো কাজে লাগবে না। এই অতিথির পেছনে তার যে খরচ হয়েছিল সেজন্য তার আপশোশ হচ্ছিল। বহুবার সে তাঁকে বিশেষভাবে উপরোধ জানিয়েছিল, ওসব বাদ দিয়ে রহস্যময় এবং লাভ হয় এমন কিছু শেখাতে; তাঁর মত বিখ্যাত লোকের তো সেসব জানা থাকবার কথা। কিন্তু তাতেও যখন কোনো লাভ হল না, তখন সে বিচারসভার কাছে চিঠি দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করল। লিখেছিল, এই

অসৎ এবং অকৃতজ্ঞ লোকটি তার সামনে যীশুখৃষ্ট সম্বন্ধে খারাপ কথা বলেছে, যাজকদের সম্বন্ধে বলেছে, তারা নাকি সব গর্দভ এবং দেশের লোকদের বোকা বানিয়ে রেখেছে, তাছাড়াও এর বক্তব্য, বাইবেলের বর্ণনার পরিপন্থী, একটি মাত্র স্বর্গ নয়, অসংখ্য স্বর্গের অস্তিত্বের কথা, ইত্যাদি, প্রভৃতি। সে, মোকেনিগো সেইজন্য তাকে ছাদের ঘরে তালা দিয়ে রেখেছে এবং অনুরোধ জানাচ্ছে, যথা শীঘ্র সম্ভব আরক্ষা পাঠিয়ে তাকে নিয়ে যেতে।

আরদালরাও এসেছিল এক রবিবার আর সোমবারের মাঝের রাত্রে এবং সেই পণ্ডিতকে নিয়ে যায় বিচারসভার বন্দীশালায়।

এই ঘটনা ঘটেছিল ২৫শে মে, ১৫৯২ সালে, সোমবার ভোর রাত্রি তিনটের সময়, আর সেই দিন থেকে যেদিন তিনি কাঠের চিতায় ওঠেন, সেই ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৬০০ সালের মধ্যে নোলার সেই লোকটি আর বন্দীশালার বাইরে আসেননি।

সেই অসম্ভব বিচার যতদিন চলেছিল সেই আট বছর ধরে তিনি তাঁর জীবনের জন্য অক্লান্ত সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন, অবশ্য প্রথম বছরে যখন তাঁকে ভে... থেকে রোমে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়, তখনকার একটা প্রচেষ্টা সম্বন্ধে... বন্দী ভুলবুদ্ধি করে দেয়।

ঐ ওভারকোটের কাহিনী সেই সময়ের।

১৫৯২ সালের শীতকালে, তখন তিনি একটা হোটেলে থাকেন, গাব্রিয়েলে ব্রুণ্জো নামে এক দর্জির কাছে মোটা একটা ওভারকোটের মাপ দেন। যখন তাঁকে গ্রেফ্‌তার করা হয় তখনো ওটার দাম দেওয়া হয়নি।

গ্রেফ্‌তারের খবর পাওয়া মাত্র দর্জিটি ছুটে যায় মোকেনিগোর বাড়ীতে, সেটা সেন্ট স্যামুয়েল-এর কাছাকাছি, সেখানে সে তার পাওনার রসিদ পেশ করে। ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। মোকেনিগোর এক কর্মচারী তাকে সদর দরজা দেখিয়ে দেয়। "এই জোচ্চোরটার পেছনে আমরা অনেক খরচ করেছি", এই কথা সে এত জোর চিৎকার করে বলে যে কিছু পথচারী ফিরে তাকায়। "বরং ধর্মীয় আদালতের ট্রাইবুনালের কাছে ছুটে যান, সেখানে গিয়ে বলুন যে আপনার সঙ্গে এই বিরোধী লোকটির যোগাযোগ আছে।"

দর্জিটি ভয় পেয়ে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে রইল। সেই গলির এক দঙ্গল ছোকরা সব শুনেছিল, তাদের মধ্যে একজন, একটা সর্বাঙ্গে গুটি ওঠা লোকজা

বেঁটে ছোকরা তাকে একটা ঢিল ছুঁড়ে মারে। অবশ্য একটি গরিবী পোশাক পরা মহিলা একটা দরজা খুলে বাইরে এসে ছোকরাটাকে একটা চড় কষিয়েছিল, তবে ৎস্লেটোর বয়স হয়েছে, সে স্পষ্ট বুঝতে পারল, "সেই বিরোধী লোকটার সঙ্গে যোগাযোগ থাকা" তার পক্ষে বিপদের কারণ হতে পারে। সে লজ্জায় এদিক ওদিক দেখতে দেখতে মোড় ঘুরে অনেক ঘুর পথে বাড়ী গেল। তার দুর্ভাগ্যের কোনো কথা তার স্ত্রীকে বলল না, আর তার স্ত্রী এক সপ্তাহ ধরে তার এই মনমরা ভাব দেখে অবাক হল।

কিন্তু পয়লা জুন তারিখে হিসাব লিখতে গিয়ে সে দেখল, একটা ওভারকোটের দাম পাওনা আছে এমন একজন লোকের কাছে যার নাম তখন সকলের মুখে মুখে ঘুরছে; লোলার লোকটি তখন শহরের আলোচনার বিষয়। লোকটার মন্দ স্বভাব সম্বন্ধে ভয়ঙ্কর সব গুজব শোনা যাচ্ছিল। লোকটা শুধু বই-এ বা বক্তৃতায় বিবাহের পবিত্রতাই নোংরামিতে টেনে নামায়নি, স্বয়ং যীশুখ্রীষ্টকেও একটা ভণ্ড বলেছে, তাছাড়া স্বর্গ সম্বন্ধে ভীষণ অদ্ভুত সব কথা বলেছে। সে যে তার ওভারকোটের দাম দেবে না, এতো জানা কথা। সেই ভালমানুষ মহিলাটির এই ক্ষতি স্বীকার করে নেবার কোনো রকম ইচ্ছাই ছিল না। স্বামীর সঙ্গে বেশ একদফা কথা কাটাকাটির পর সেই সত্তর বছরের বৃদ্ধা তার সবচেয়ে ভাল পোশাকে সেজে ধর্মীয় বিচার সভা যে বাড়ীতে বসে সেখানে গিয়ে হাজির হল, তারপর রাগী ভাবে বত্রিশ ক্ষুডি দাবী করল, সেই বিরোধী লোকটার কাছে তার ওটা পাওনা।

যার সঙ্গে সে কথা বলেছিল সেই কর্মচারীটি তার দাবীর কথা লিখে রাখল আর কথা দিল, ব্যাপারটা সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া হবে।

তারপর দু-চারদিনের মধ্যেই ৎস্লেটো একটা খবর পেল দেখা করতে যাবার, আর কাঁপতে কাঁপতে এবং ভয়ে ভয়ে সে গিয়ে হাজির হল সেই ভীষণ বাড়ীটায়। সে অবাক হয়ে গেল যখন তাকে কেউ কোনো রকম জেরা করল না, বরং তাকে জানিয়ে দেওয়া হল কেবল যে গ্রেফ্‌তার করা লোকটির আর্থিক প্রসঙ্গ উঠলে তার দাবীর কথা বিবেচনা করা হবে। তবে কর্মচারীটি আভাসে জানিয়ে দিল, তাতে খুব একটা লাভ হবে না।

এত সহজে নিস্তার পেয়ে বৃদ্ধ লোকটি এত খুশী হল যে খুব বিনীত ভাবে ধন্যবাদ জানাল। কিন্তু তার স্ত্রী সন্তুষ্ট হতে পারল না। সেই ক্ষতি পূরণের

জন্য তার দাবী সত্যের আজ্ঞা ছেড়ে অনেক রাত অবধি সেলাই করবে, তা যথেষ্ট নয়। কাপড় যার কাছ থেকে কেনা হয়েছিল তার কাছে দেনা আছে, সেটা শোধ করতে হবে। মহিলাটি রান্নাঘরে আর উঠানে চিৎকার করে বেড়াতে লাগল যে একজন ভুক্তভোগীকে তার দেনা শোধ করার আগে হাজতে পুরে রাখা ব্যাপারটা লজ্জার। সে দরকার হলে রোমে পবিত্র পিতার কাছেও যাবে, তার বত্রিশ স্কুডি আদায় করতে। "চিতায় ওঠবার সময় তার ওভারকোটের দরকার হবে না", বলে চেঁচামেচি করল।

তার দাদার কনফেসর-এর কাছে গিয়ে তাদের এই সর্বনাশের কথা বলল। তিনি পরামর্শ দিলেন, অন্তত ওভারকোটটা তাদের ফেরত দেওয়া হোক এই দাবী জানাতে। সে তাতে বুঝল যে গীর্জার বিচারে স্বীকার করা হচ্ছে যে তার দাবী করবার অধিকার আছে, এবং জানাল, ওভারকোটটা নিশ্চয় ব্যবহার করা হয়ে গেছে, তাছাড়া ওটা মাপ নিয়ে বানানো হয়েছে, তাই ওটা পেয়ে সে কোনোক্রমেই সন্তুষ্ট হতে পারবে না। সে দাম চায়। উত্তেজিত হয়ে এই কথা বলতে গিয়ে গলার স্বর একটু উঁচুতে তুলেছিল বলে পাদ্রীটি তাকে বাইরে বার করে দিল। তার ফলে তার মাথা একটু ঠাণ্ডা হল, কয়েক সপ্তাহ চুপচাপ থাকল। ধর্মীয় বিচার সভার সেই বাড়ী থেকে গ্রেফ্‌তার হওয়া বিরোধী লোকটির ব্যাপারে আর কোনো খবর নেই। তবে সর্বত্র কানাঘুষা শোনা যাচ্ছিল যে জেরার উদ্দেশ্য সাংঘাতিক সব অপরাধ প্রকাশ করা। এইসব গুজব বুড়ীটি ব্যগ্রভাবে শুনে বেড়াচ্ছিল। বিরোধী লোকটার অবস্থা এত খারাপ জেনে সে বেশ কষ্ট পাচ্ছিল। লোকটা কোনোদিনই আর ছাড়া পাবে না আর তার দেনাও শোধ করতে পারবে না। বুড়ীর আর ঘুম হয়না রাতে। তারপর আগষ্ট মাসের গরমে যখন তার ধৈর্য সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত, তখন যেখানে সে কেনাকাটা করতে যেত কিম্বা যেসব খদ্দের পোশাক পরে দেখতে আসত তাদের কাছে তার অভিযোগ সুযোগ পেলেই কলকলিয়ে বলতে শুরু করল। তার বক্তব্য ছিল, পাদ্রীরা এক পাপ করবে যদি তারা একজন সামান্য কারিগরের দাবীর ব্যাপারে উদাসীন হয়। ট্যাক্স-এর চাপ বাড়ছে, আর রুটির দামও এই কদিন আগে বেড়েছে।

একদিন সকালের দিকে এক কর্মচারী এসে তাকে ধর্মীয় আদালতের বাড়ীতে নিয়ে গেল। সেখানে তাকে স্পষ্টভাবে সাবধান করে দেওয়া হল, তার ঐ ক্রুদ্ধ বকবকানি থামাতে হবে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল,

সামান্য কটা। ছুভির জন্য একটা প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কাজ লোকের মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এর জন্য তার লজ্জা হয় কিনা। তাকে জানিয়ে দেওয়া হল, তার মত লোককে ঠাণ্ডা রাখবার সমস্ত ব্যবস্থাই আছে।

তাতে কিছুকালের জন্য ফল হল, যদিও একজন পাত্রীর চোপা থেকে উগরে দেওয়া "সামান্য কটা ছুভির জন্য" কথা কটি বলার ধরনের কথা মনে এলেই বিরক্তিতে মুখটা তার লাল হয়ে ওঠে। কিন্তু সেপ্টেম্বরে শোনা গেল, রোমের ধর্মীয় বিচারসভার প্রধান আদেশ করেছেন, নোলার লোকটিকে পাঠিয়ে দেবার, সিমোরিয়াতে শুনানি হবে।

এই পাঠিয়ে দেবার চেষ্টার ব্যাপারে শহরের সব লোক আলোচনায় মুখর হয়ে উঠল। সাধারণ মানুষের মত এই পাঠানোর বিপক্ষে। রোমের বিচার সভা তাদের ওপর খবরদারি করবে, এটা কেউ চায় না।

বুড়ীটার অবস্থা কাহিল। বিরোধী লোকটাকে কি সত্যি সত্যিই তার দেনা মেটানোর আগে রোমে যেতে দেবে? যথেষ্ট হয়েছে। এই অবিশ্বাস্য খবর শুনতে না শুনতেই, একটা ভাল স্কার্ট পরবার সময়ও নষ্ট না করে, সে ধর্মীয় আদালতের বাড়ীর পথে রওনা হল।

এবার একজন বড় কর্মচারী তার সঙ্গে দেখা করল, আগের কর্মচারীদের তুলনায় এ লোকটি তার সঙ্গে সম্পূর্ণ অন্য রকম ব্যবহার করল। লোকটির বয়স প্রায় তার নিজের বয়সের সমান আর সে তার নালিশ ঠাণ্ডা মাথায় মনযোগ দিয়ে শুনল। বুড়ীর কথা শেষ হলে সে একটু সময় চুপ থেকে প্রশ্ন করল, সে ব্রুনোর সাথে দেখা করতে চায় কিনা।

বুড়ী তৎক্ষণাৎ রাজী হল। পরদিন তাদের দেখা করার ব্যবস্থা করা হল।

সেদিন সকালের দিকে লোহার গরাদ দেওয়া জানালাওয়ালা একটা ছোট্ট ঘরে বুড়ীর কাছে এল একজন বেঁটে, রোগা লোক, তার মুখে হাল্কা কালো দাড়ি। লোকটি এসে বিনীতভাবে তার দাবীর কথা জানতে চাইল।

সেই মাপ নেবার সময় বুড়ী তাকে দেখেছিল আর এই এতদিন তার মুখটা বেশ ভাল মনে ছিল, এখন কিন্তু দেখামাত্র চিনে উঠতে পারল না। জেরার উত্তেজনায় ফলে নিশ্চয় তার চেহারার পরিবর্তন হয়েছে।

বুড়ী তাড়াতাড়ি করে বলল, "ওভারকোটটা। আপনি ওটার দাম দেননি।"

লোকটি একটু সময় অবাক ভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর তার সংবিৎ ফিরল, আস্তে করে জিজ্ঞাসা করল: "কত ধার আছে আপনার কাছে?"

"বত্রিশ ফ্লুডি", বলল বুড়ী, "আপনি তো রসিদ পেয়েছিলেন।"

একজন লম্বা চওড়া কর্মচারী পাহারায় ছিল, লোকটা তার দিকে ঘুরে জিজ্ঞাসা করল, সে জানে কিনা, তার সম্পত্তি হিসেবে মোট কি পরিমাণ অর্থ এই ধর্মীয় বিচারসভার বাড়ীতে জমা দেওয়া হয়েছে। সে লোকটি তা জানত না, তবে অবশ্য কথা দিল, সেটা দেখবে।

"আপনার স্বামী কেমন আছেন?" জিজ্ঞাসা করল সেই বন্দী, আবার বুড়ীর দিকে ফিরে, যেন সেই সঙ্গে ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে গেছে এবং স্বাভাবিক সম্পর্ক ফিরে এসেছে, প্রচলিত দেখা-সাক্ষাতের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

আর এই ছোটখাট লোকটির সৌজন্যে অভিভূত হয়ে সেই বৃদ্ধা বিড়বিড় করে বলল, তার স্বামী ভাল আছে, এমনকি সেই সঙ্গে তার বাতের যন্ত্রণার কথাও জুড়ে দিল।

সেই ধর্মীয় আদালতের বাড়ীতে সে গেলও আবার দুদিন পরে, কারণ তার মনে হয়েছিল, ভদ্রলোককে খোঁজ খবর করবার জন্য একটু সময় দেওয়াটাই উচিত কাজ।

সত্যি সত্যিই সে সেই লোকটির সঙ্গে আবার দেখা করবার অনুমতি পেল। তাকে অবশ্য সেই লোহার গরাদ দেওয়া জানালাওয়ালা ছোট্ট ঘরটাতে এক ঘণ্টারও বেশী অপেক্ষা করতে হয়েছিল, কারণ তখন লোকটাকে জেরা করা চলছিল।

লোকটি এল আর তাকে দেখে খুব ক্লান্ত মনে হল। আর একটাও চেয়ার ছিল না বলে লোকটা দেয়ালে সামান্য হেলান দিয়ে দাঁড়াল। যাইহোক লোকটি তৎক্ষণাৎ কাজের কথা শুরু করল।

খুব দুর্বল স্বরে লোকটি বলল, ওভারকোটটার দাম দেবার মত অবস্থা তার নেই বলে সে লজ্জিত। তার সম্পত্তির মধ্যে একটা ফ্লুডিও পাওয়া যায় নি। তবুও তার সব আশা ত্যাগ করবার দরকার নেই। সে ভেবে দেখেছে এবং তার মনে পড়েছে, ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে একজন লোক আছে, যে তার বইগুলো ছাপে, তার কাছে এখনো কিছু পাওনা আছে। সে তাকে চিঠি দেবে যদি তাকে সে অনুমতি দেওয়া হয়। অনুমতির জন্য সে পরদিনই চেষ্টা করবে। আজ জেরা চলবার সময় তার মনে হয়েছে যেন অবস্থাটা তেমন ভাল নয়। তাই সে ও প্রসঙ্গ তোলেনি, তাহলে হয়তো সবটাই পণ্ড হতো।

যখন লোকটি কথা বলছিল, তখন বুড়ীটি তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটিকে খুঁটিয়ে দেখছিল। যারা ধারে জিনিস কেনে সেই সব উদাসীন লোকেদের ওজর অসুবিধাগুলোর ব্যাপার সবই তার জানা। তাদের দারিদ্র্যের কথা তারা বোঝায় ভিন্ন ভাবে, তারপর যখন লোকে নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে থাকে, তখন তারা এমন ভাব করে যেন আকাশ পাতাল লণ্ডভণ্ড করছে।

"দাম দেবার ক্ষমতাই যখন ছিল না, তখন আপনার ওভারকোটের দরকারটা কেন পড়েছিল?" জিজ্ঞাসা করল কড়া স্বরে।

বন্দী লোকটা মাথা নেড়ে জানাল, সে বুড়ীর মনের কথা বুঝতে পারছে। বলল :

"বই লিখে আর ছাত্র পড়িয়ে আমি সব সময়ে রোজগার করতাম। তাই আমি ভেবেছিলাম, ঐভাবেই রোজগার হবে। আর ওভারকোটটা দরকার হবে ভেবেছিলাম, কারণ আমার ধারণা ছিল আমাকে বাইরে ঘোরাফেরা করতে হবে।"

তার এই কথাগুলোর মধ্যে কোনো তিক্ততা ছিল না, বোঝা গেল শুধু, সে উত্তরটা দেওয়া দরকার মনে করে'

বুড়ীটি আবার তাকে পা থেকে মাথা অবধি দেখল, খুব বিরক্ত ; তবে তার মনে হল, আর তাকে প্রশ্ন করার দরকার নেই, তাই আর একটা কথাও না বলে সে ঘুরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'যার বিরুদ্ধে ধর্মীয় বিচার সভা মামলা করছে, তাকে আবার কে অর্থ সাহায্য করবে?" এই কথা বুড়ী বলল রেগে তার স্বামীকে সেই রাতে বিছানায় শুয়ে। গীর্জার লোকরা তার ব্যাপারে যে মনোভাব দেখাচ্ছে তাতেই সে নিশ্চিন্ত, তবে তার স্ত্রী যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে দামটা আদায় করবার, সে ব্যাপারে তার সংশয় ছিল।

"তার হয়তো এখন অন্য ঝামেলার কথা ভাবতে হচ্ছে", বলল গজগজিয়ে।

বুড়ী আর কোনো কথা বলল না।

পরের মাসগুলো কেটে গেল, ঐ বিশ্রী ব্যাপারে নতুন কিছু ঘটল না। জানুয়ারীর প্রথম দিকে শোনা গেল সিনোরিয়া ভাবছে পোপের ইচ্ছা অনুসারে বিরোধী লোকটাকে পাঠিয়ে দেবার কথা। আর সেই সময়ে ব্রুনোর কাছে একটা নতুন আমন্ত্রণ আসে, ধর্মীয় আদালতের বাড়ীতে যাবার জন্য।

কোনো বিশেষ সময়ের উল্লেখ ছিল না, তাই ফ্রাউ ব্রুনো একদিন

দিকেলে গেল। সে অসময়ে উপস্থিত হয়েছিল। বন্দী তখন গণতন্ত্রের প্রকুরেটার-এর অপেক্ষায় ছিল। প্রকুরেটারকে সিনোরিয়ার তরফ থেকে তার দেওয়া হয়েছিল, বন্দীকে পাঠিয়ে দেবার ব্যাপারের ব্যবস্থা পাকা করতে। বুড়ীর সঙ্গে সেই বড় কর্মচারীটি, যে মোলার লোকটির সাথে তার প্রথম কথা বলবার সুযোগ করে দিয়েছিল। সেই প্রবীণ লোকটি তাকে জানাল, বন্দী তার সঙ্গে কথা বলবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, তবে তার ভেবে দেখা উচিত ঠিক এই সময়ে দেখা করাটা ঠিক হবে কিনা, কারণ এক্ষুনি বন্দীকে এমন একটা সাক্ষাৎকার করতে হবে, যা তার কাছে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বুড়ী শুধু বলল, তাকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখলেই হয়।

কর্মচারীটি চলে গেল তারপর বন্দীকে সঙ্গে করে নিয়ে এল। কথাবার্তা চলল সেই বড় কর্মচারীর উপস্থিতিতে।

মোলার লোকটি দরজার কাছে এসেই একটু হেসেছে, কিন্তু কিছু বলতে পারার আগেই বুড়ী মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল :

"এমন ভাব দেখাম কেন বলুন তো, যেন আপনি বাইরে বেরোতে চান ?"

এক মুহূর্তের জন্য মনে হল, সেই ছোটখাট লোকটি একটু হতভম্ব হয়ে গেছে। গত তিনমাস ধরে সে অনেক প্রশ্নের জবাব দিয়েছে, আর এই হকি-বৌ-এর সঙ্গে শেষ কি কথা হয়েছিল, তা তার ঠিক মনে নেই।

"আমার নামে কোনো অর্থ এসে পৌঁছোয় নি", বলল অবশেষে, "আমি দুবার ও ব্যাপারে চিঠি দিয়েছি, কিন্তু কিছুই আসেনি। আমি ভেবে দেখলাম, তোমরা ওভারকোটটা ফেরত নেবে কিনা।"

"আমি জানতাম তো, এই হবে", বলল দুপার সঙ্গে। "ওদিকে ওটা মাপমত তৈরী, বেশীর ভাগ লোকেরই গায়ে খাট হবে।"

মোলার লোকটি ক্লান্তভাবে তাকাল সেই বুড়ার দিকে।

"সেকথা আমি ভাবিনি", বলে তাকাল গীর্জার লোকটির দিকে।

"আমার যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রি করে সেই অর্থ এদের হাতে তুলে দেওয়া যায় না ?"

"সেটা সম্ভব হবে না", যে কর্মচারীটি তাকে নিয়ে এসেছিল সে বলল, সেই লম্বা চওড়া লোকটা। "ওসব দেনার লোকেরা দাবী করেছে। আপনি অনেক দিন তার খরচে কাটিয়েছেন।"

"সে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল", নোনার লোকটি প্রতিবাদ করল ক্লান্তভাবে।

বৃদ্ধ কর্মচারী হাত তুলল।

"এখন ওসব কথার সময় নয়, সত্যিই না। আমার মনে হয়, ওভারকোটটা ফেরত দিয়ে দেওয়া উচিত।"

"সেটা দিয়ে আমরা কী করব?" বুড়ীর সেই একরোখা প্রশ্ন।

বৃদ্ধের মুখটা একটু লাল হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে বলল:

"একটা কথা শুনুন, সামান্য একটু মানবিক ব্যবহার আপনার পক্ষে বেমানান হবে না। অভিযুক্ত এই লোকটি এমন একটা বিতর্কের সঙ্গে জড়িত যার মর্ম তার কাছে জীবন বা মৃত্যু হতে পারে। আপনি নিশ্চয় দাবী করেন না যে এখন লোকটির পক্ষে আপনার ওভারকোট নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়।"

বুড়ী তার দিকে অনিশ্চিতভাবে তাকাল। হঠাৎ তার মনে পড়ল, সে কোথায় দাঁড়িয়ে। ভাবছিল, এখন চলে যাওয়াই ঠিক হবে কিনা, এমন সময় তার পেছনে বন্দীকে নীচু গলায় বলতে শুনল:

"আমার মনে হয়, সেই দাবী করতে পারে।"

তারপর যখন সে বন্দীর দিকে ফিরে দাঁড়াল, তখন লোকটা আরো বলল: "আপনাকে এসবই ক্ষমা করতে হবে। আপনার ক্ষতিতে কিছু যায় আসে না, এমন কথা কখনই ভাববেন না। আমি এব্যাপারে একটা দরখাস্ত করব।"

বৃদ্ধ কর্মচারীটির এক ইশারায় লম্বা চওড়া লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর ফিরে এসে হাতদুটো ছড়িয়ে বলল: "ওভারকোটটা আদতে এখানে জমাই দেওয়া হয়নি। সেই মোকেনিগো নিশ্চয় ওটা রেখে দিয়েছে।"

নোনার লোকটি স্পষ্টতই চমকে উঠল। তারপর দৃঢ় স্বরে বলল:

"এটা ঠিক নয়। আমি ওর নামে নালিশ করব।"

বৃদ্ধ কর্মচারীটি মাথা নাড়ল।

"দুচার মিনিট পরেই যে আলোচনায় আপনাকে অংশ নিতে হবে, বরং সেই ব্যাপারে ভাবুন। সামান্য—কয়েকটা স্কুডির জন্য এত ঝামেলা আমি আর চালাতে দিতে পারি না।"

বুড়ীর মাথায় রক্ত উঠে গেল। নোনার লোকটি যতক্ষণ কথা বলছিল, ততক্ষণ সে চুপ করে ছিল, মুখ বুজে ঘরের এক কোণের দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু এবার তার ধৈর্যের সীমা ভেঙে পড়েছে।

"কয়েকটা ছুটি!" চিৎকার করে উঠল। "ওটা একমাসের রোজগার! আপনি অনায়াসে বলে দিতে পারেন। তাতে কোনো ক্ষতি হবে না!"

ঠিক এই সময়ে একজন বিশাল লম্বা যুবক দরজায় এসে দাঁড়াল।

"প্রকুরেটর এসেছেন", বলল অবাক হয়ে বুড়ীকে চেঁচাতে দেখে।

লম্বা চওড়া লোকটা মোটার লোকটির হাত ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল। বন্দী তার অপ্রশস্ত কাঁধের ওপর দিয়ে যতক্ষণ না তাকে চৌকাঠ পার করে নিয়ে গেল, ততক্ষণ মহিলাটির দিকে তাকিয়ে দেখছিল। তার লম্বা মুখটা বেশ ফ্যাকাশে।

বুড়ী ক্ষুব্ধ মনে সেই বাড়ীর পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। কি ভাববে তাই সে বুঝতে পারছিল না। যাইহোক, লোকটা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে।

এক সপ্তাহ পরে সেই লম্বা চওড়া লোকটা যেদিন ওভারকোটটা নিয়ে এল তার আগে বুড়ী আর সেলাই কারখানায় যায়নি। দরজায় কান পেতে সেই কর্মচারীকে বলতে শুনল: "লোকটা সত্যিসত্যিই সেই শেষ কটা দিনও এই ওভারকোটের ব্যাপারে চেষ্টা করেছে। জেরা এবং বিতর্কের মাঝে দুবার সে দাবী পেশ করেছে, সেখানে শহরের সব আমলারা উপস্থিত ছিল, তাছাড়া বহুবার সে চেষ্টা করেছে এই ব্যাপারে পোপের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলবার। তার চেষ্টা সফল হয়েছে। সেই যোকেনিগো ওভারকোটটা দিতে বাধ্য হয়েছে। তবে একটা কথা, এই ওভারকোটটা এখন তার খুবই উপকারে লাগতে পারত, কারণ তাকে এখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এই সপ্তাহের মধ্যেই তাকে রোমে যেতে হবে।"

কথাটা ঠিক। তখন জানুয়ারীর শেষ।

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

আজার এবং তাঁর সৈনিক

১

সীজার

মার্চ মাসে শুরু থেকেই সেই ডিক্টেটর জানত, তার ডিক্টেটরশীর দিন শেষ হয়ে এসেছে।

গ্রাম থেকে আসা নতুন লোকের কাছে শহরটা হয়তো অসাধারণ সুন্দর মনে হতে পারতো। শহরটা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠেছে; লোকজনের বাসস্থানগুলি মনোরম অধিবাসীদের চাপে ফেটে পড়বার মত; বিশাল বিশাল সরকারী প্রাসাদগুলো তৈরী প্রায় শেষ হয়ে এসেছে; শহরটা পরিকল্পনায় মুখর; অর্থনৈতিক অবস্থা সাধারণ; ক্রীতদাস সস্তা।

সরকার স্থায়ী বলে মনে হয়। ডিক্টেটরকে সবে তাঁর মৃত্যুকাল অবধি ডিক্টেটর করাব কথা ঘোষণা করা হয়েছে এবং তখন তিনি 'তাঁর সবচেয়ে বড় প্রকল্পের জন্য' তৈরী হচ্ছেন, প্রাচ্য দেশ জয় করা, বহুকাল যাবৎ আকাঙ্খিত পারস্য অভিযান। আলেক্সাণ্ডারের মত প্রকৃত দ্বিতীয় অভিযান।

সীজার জানতেন, তিনি সেই মাসটা পার করতে পারবেন না। তিনি তাঁর ক্ষমতার শীর্ষে। তাঁর সামনে অতএব পতন।

১৩ই মার্চের বিশাল সিনেট-অধিবেশনে ডিক্টেটর তাঁর বক্তৃতায় 'পারস্য সরকারের আসন্ন শঙ্কাজনক মনোভাবের' প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন এবং তিনি যে মিশরের রাজধানী আলেক্সান্দ্রিয়াতে সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছেন সে খবর প্রকাশ করেন, তার ফলে সিনেটের এক লক্ষণীয়, রীতিমত উদাসীন নিষ্প্রাণ মনোভাব প্রকাশ পায়। বক্তৃতা চলাকালে ডিক্টেটর কি পরিমাণ অর্থ স্পেন-এর ব্যাঙ্কে বেনামীতে জমা দিয়েছেন তার এক অদ্ভুত তালিকা সিনেটরদের মধ্যে ঘুরছিল: 'ডিক্টেটর তাঁর ব্যক্তিগত ধনদৌলত (১১ কোটি) বিদেশে পাচার করে দিয়েছেন!' তাহলে কী তিনি তাঁর যুদ্ধে আস্থা রাখতে পারছেন না? কিম্বা

তাঁর উদ্দেশ্য আসলে পারস্য দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নয়, উদ্দেশ্য রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ?

যথারীতি যুদ্ধের খরচ সিনেট সর্বসম্মতিক্রমে মঞ্জুর করল।

প্রাচ্যদেশ প্রসঙ্গে যাবতীয় চক্রান্তের কেন্দ্র ক্লেয়োপেত্রার প্রাসাদে সেনা বিভাগের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত লোকেরা মিলিত হয়েছে। মিশরের রানীই পারস্য-যুদ্ধের প্রকৃত প্রেরণা। ব্রুটাস আর ক্যাসিয়াস এবং অন্যান্য যুবক অফিসাররা সিনেটে ক্লেয়োপেত্রার যুদ্ধনীতির সর্বাঙ্গীণ সাফল্যের জন্য তাকে অভিনন্দিত করল। সেই অশুভ তালিকা ঘোরানোর বুদ্ধিটা তার, সেজন্য যথাযথ বিস্ময় প্রকাশ করা হল, হাসাহাসি চলল। মঞ্জুর করা অর্থ শহরে সংগ্রহ করতে গেলে ডিক্টেটর অবাক হবেন…

সিনেটের যাবতীয় ব্যাপারে উদাসীন তৎপরতা সীজারের দৃষ্টি এড়ায়নি, তাছাড়াও তিনি শহরে সত্যিসত্যিই একটা অস্বাভাবিক অস্বস্তিজনক অবস্থার কথা জানবার সুযোগ পেলেন। ব্যবসায়ী সংঘে দেয়ালে ঝোলানো মস্ত একটা ম্যাপের সামনে দাঁড়িয়ে অর্থনীতিবিদদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন পারস্য এবং ভারতবর্ষের দিকে সৈন্য পাঠাবার পরিকল্পনার কথা। সেই লোকেরা মাথা নেড়ে জানাল তারা বুঝতে পেরেছে, কিন্তু শুরু করল ফরাসীদের কথা বলতে, যে দেশ কয়েক বছর আগেই সেই দেশ জয় করা হয়ে গেছে, কিন্তু সেখানে আবার প্রকাণ্ড বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। 'নতুন ব্যবস্থা' কাজ করছে না। একটা প্রস্তাব এল : এই নতুন যুদ্ধ শরৎকালে শুরু করা যায় না ? সীজার উত্তর দিলেন না, সোজা বেরিয়ে গেলেন। সমবেত লোকেরা রোমীয় পদ্ধতিতে হাত তুলে অভিবাদন জানাল। কে একজন বিড়বিড় করে বলল, "একটুও সাহস আর নেই, লোকটা—।"

ওরা কি হঠাৎ আর যুদ্ধ চায় না ?

খবর নিয়ে জানা গেল অদ্ভুত এক সত্য। অস্ত্র তৈরীর কারখানাগুলিতে পাগলের মত যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে, তাদের শেয়ারের দাম হঠাৎ বেড়ে গেছে, ক্রীতদাসদের দামও বাড়তির দিকে…

এর অর্থ কী ? ওরা ডিক্টেটরের প্রস্তাবমত যুদ্ধ চায় অথচ সেজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে অনিচ্ছুক ?

সন্ধ্যার দিকে সীজার জানতে পারলেন এসবের অর্থ—'ওরা যুদ্ধ চায়, তবে তাঁকে বাদ দিয়ে।'

তিনি আদেশ দিলেন, পাঁচজন ব্যাঙ্কারকে গ্রেফ্‌তার করতে, অথচ তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন, প্রায় সমস্ত সাহস হারিয়ে ফেললেন, তাই দেখে তাঁর এক সেনাপতি অবাক হল, সে তাঁকে রক্তাক্ত যুদ্ধের মাঝখানে সম্পূর্ণ শান্ত থাকতে দেখেছে। ক্রটাস এলে তিনি কিছুটা শান্ত হলেন, তাকে তিনি খুব স্নেহ করেন। তবুও কিন্তু তিনি একটা ফাইল খুলে দেখবার মত যথেষ্ট সাহস পেলেন না। ফাইলটা তাঁর এক অনুচর শহর থেকে পাঠিয়েছে। ঐ ফাইলে আছে ষড়যন্ত্রকারীদের নাম, তার মধ্যে ক্রটাসের নামও আছে। তারা তাঁকে হত্যা করবার চক্রান্ত করছে। ঐ মোটা ফাইলে ("ওটা এত বেশী মোটা, ভয়ঙ্কর মোটা") বিশ্বস্ত লোকেদের নামও থাকতে পারে, সেই ভয় ডিক্টেটরকে বাধা দিল ওটা খুলে দেখতে। সীজার যখন ওটা না খুলেই তাঁর একজন সেক্রেটারীকে ফেরত দিলেন—পরে এক সময়ে দেখবেন বলে, তখন ক্রটাসের এক গ্লাস জল দরকার হল।

ক্রটাস যখন ফ্যাকাশে মুখে বিচলিতভাবে ক্লেয়োপেত্রার প্রাসাদে এসে জানাল যে ষড়যন্ত্র ব্যাপারে একটা ফাইল আছে, তখন সেখানে যেন আতঙ্কের এক বিস্ফোরণ ঘটল। যে কোনো মুহূর্তে সীজার সেটা পড়তে পারেন। অনেক চেষ্টায় ক্লেয়োপেত্রা উপস্থিত সকলকে শান্ত করল, তাদের সৈনিক মর্যাদার দোহাই দিয়ে। তারপর নিজেই আদেশ দিল আত্মগোপন করতে।

ইতিমধ্যে পুলিশ-প্রধান এসেছে সীজারের কাছে। এই বছরে এটি তৃতীয় ব্যক্তি, আর এই বছরের বয়স সবে দু'মাস। তার আগের দুজন ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় বরখাস্ত হয়েছে। এই পুলিশ-প্রধান ডিক্টেটরের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দায়িত্ব নিল—যদিও ব্যাঙ্কারদের গ্রেফ্‌তার করার ফলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে এবং সেজন্য প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ব্যস্ত হয়েছে···। পারস্য অভিযান যে শীঘ্র শুরু হবে, এ ব্যাপারে এই প্রধানকে নিশ্চিত মনে হল, তার মতে তখন বিরোধী পক্ষ চুপ করে যাবে। যখন লোকটা নিরাপত্তার ব্যাপক ব্যবস্থা বুঝিয়ে বলছে, যেসব ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে বলে সে মনে করে, সেসব কথা বলছে, তখন সীজার লোকটার মধ্য দিয়ে দিব্য দৃষ্টির মত দেখতে পেলেন, কিভাবে তিনি মরবেন ; কারণ তিনি মরবেন।

তিনি বলবেন তাঁকে পম্পেয়ুস-এর পর্টিকোতে নিয়ে যেতে, সেখানে নামবেন, প্রার্থীদের ব্যবস্থা করবেন, মন্দিরে যাবেন, সিনেটরদের একজনকে বা অন্যজনকে এক ঝলক দেখবেন, অভিবাদন করবেন জোরে বলবেন।

তখন সেই ষড়যন্ত্রকারীরা—সীজারের দিব্যদৃষ্টিতে তাদের মুখ নেই, যেখানে মুখগুলো থাকবার কথা সেখানে শুধু সাদা দাগ—তাঁর দিকে এগিয়ে আসবে কোনো একটা অজুহাত দেখিয়ে। কেউ তাঁকে একটা কিছু পড়তে দেবে, তিনি সেদিকে হাত বাড়াবেন, ওরা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, 'তিনি মারা যাবেন'।

না, প্রাচ্যদেশ অভিযান তাঁকে আর করতে হবে না। তাঁর যাবতীয় কার্যকলাপের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড়, সেটা আর ঘটবে না। 'একটা উপায় ছিল, জীবিত অবস্থায় একটা জাহাজে ওঠা', সেই জাহাজ পারত তাঁকে আলেকজান্দ্রিয়াতে তাঁর সৈন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে, একটি মাত্র জায়গায়, যেখানে তিনি হয়তো নিরাপদ।

অনেক রাতে যখন প্রহরীরা কয়েকজন লোককে ডিক্টেটরের প্রাসাদে যেতে দেখে, তারা তখনো ভাবে, ওরা সব সেনানায়ক, পারস্য অভিযান প্রসঙ্গে কথা বলতে চায়। কিন্তু তারা আসলে ডাক্তার, ডিক্টেটরের ঘুমের ওষুধ দরকার।

পরদিন, ১৮ই মার্চ কেটে যায় বিভ্রান্তি আর নিদারুণ মানসিক অশান্তির মধ্যে দিয়ে। সকালে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যাবার সময় ঘোড়ায় চড়া শেখার স্কুলে সীজারের মাথায় একটা খুব ভাল বুদ্ধি এল। সিনেট এবং শহর তাঁর বিরুদ্ধে, তাতে কী? 'তিনি জনগণের আস্থা লাভের চেষ্টা করবেন!'

ছিলেন না তিনি একসময়ে জনগণের মহান নেতা, গণতন্ত্রের উজ্জ্বল আশা? তখন যে এক বিশাল পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, তার ফলে সিনেট আতঙ্কে মরতে বসেছিল, চাষের জমি বণ্টন, গরীবদের মাথা গোঁজবার ঠাঁই।

ডিক্টেটরী? আর ডিক্টেটরী নয়! মহান সীজার অবসর নেবেন, সাধারণ জীবনে ফিরে যাবেন, হয়তো স্পেন-এ চলে যাবেন··

একজন ক্লান্ত লোক ঘোড়ায় চেপেছিল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘোড়ায় চেপে চক্কর দিচ্ছিল, তারপর তার দেহভঙ্গি (বিশেষ এক চিন্তায়—জনগণের চিন্তায়) দৃঢ় হল, লাগামে টান দিল, ঘোড়াকে নিজের আয়ত্তে আনল, সেটাকে ছুটিয়ে তার খাদ বার বার করে দিল; একজন সতেজ, নতুন মানুষ সেই স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে এল।

যারা সেই বিশাল খেলায় মত্ত তাদের মধ্যে অনেকেই আজ সকালে নিজেকে সীজারের মত নিশ্চিত বোধ করছে না।··· ষড়যন্ত্রকারীরা ব্রেক্‌তার

হবার আশঙ্কায় রয়েছে। ক্রটাস তার সব বাগানে পাহারা বসিয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় ঘোড়া প্রস্তুত। কিছু বাড়ীতে কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। টিবার-এর ধারে ক্লেয়োপেত্রা তার প্রাসাদে নৃত্যাদিনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এতক্ষণে সীজার নিশ্চয় সেই ফাইল পড়ে ফেলেছে। সে বস্ত্র নিয়ে প্রসাধন সারল, ক্রীতদাসদের মুক্তি দিল, তাদের মধ্যে উপহার ভাগ করে দিল। জল্লাদরা নিশ্চয় এক্ষুনি আসবে।

গতকাল বিরোধীপক্ষ আঘাত করেছে। আজ অবশ্যই সরকারের প্রতিঘাত আসবে।

ডিক্টেটরের প্রাতঃকালীন সম্বর্ধনার সময়ে জানা যাবে প্রতিঘাতের প্রকৃতি।

প্রচুর সিনেটরের উপস্থিতিতে সীজার বললেন তাঁর নতুন পরিকল্পনার কথা। তিনি ভোটের কথা ঘোষণা করবেন, অবসর নেবেন। তাঁর আদর্শবাণী: 'যুদ্ধের বিরোধিতা!' রোমের নাগরিকরা ইটালী অধিকার করবে, পারস্য নয়। কারণ রোমের নাগরিক, দুনিয়ার শাসক, কিভাবে বেঁচে আছে সীজার তা ব্যাখ্যা করলেন।

পাথরের মত কঠিন মুখগুলো শুনল রোমের সাধারণ নাগরিকদের দুরবস্থার ভয়ঙ্কর অবস্থার কথা। ডিক্টেটর মুখোশ খুলে ফেলেছেন; তিনি জনতাকে উত্তেজিত করবেন। আধঘণ্টা পরে সমস্ত শহর একথা জানবে। শহর এবং সিনেট, ব্যাঙ্কার এবং আমলাদের মধ্যেকার শত্রুতা উধাও হবে, সবাই একটা ব্যাপারে একমত হবে: সীজারকে শেষ কর!

বক্তৃতা শেষ হবার আগেই সীজার বুঝতে পেরেছেন, একটা ভুল করা হয়ে গেছে। তাঁর এতটা খোলাখুলি না হওয়াই উচিত ছিল। হঠাৎ তাঁর বক্তৃতার বিষয় পাল্টে তাঁর চিরকালের পরীক্ষিত জাদুর আশ্রয় নিলেন। তাঁর বন্ধুদের শঙ্কিত হবার কোনো কারণ নেই। তাঁদের ভূ-সম্পত্তি সব নিরাপদ। চাষীরা যাতে জমি পায় তার চেষ্টা করা হবে, তবে সে কাজ করবে সরকার, সরকারী সম্পত্তির সাহায্যে! গ্রীষ্মকাল সুন্দর হয়ে উঠবে, তারা তাঁর বাজ্যাতে অতিথি হবে।

ওরা নিমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যাবার পর সীজার পুলিশ-প্রধানের বরখাস্ত এবং গ্রেফতারের ব্যবস্থা করলেন, লোকটি আগের দিন সন্ধ্যাতেই বন্দী ব্যাঙ্কারদের আবার মুক্তি দিয়েছিল। তারপর তিনি তাঁর

সেক্রেটারীকে পাঠালেন, গণতান্ত্রিক মহলের প্রতিক্রিয়া বাজিয়ে দেখবার জন্ত। এখন সবকিছু নির্ভর করছে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়ার ওপর।

গণতান্ত্রিক মহল হচ্ছে বহুকাল আগে বাতিল করে দেওয়া শ্রমিক-সঙ্ঘের রাজনীতিবিদরা, তারা সাধারণতন্ত্রের স্বর্ণ যুগে ভোটের সময় সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিত। একদা শক্তিশালী এই যন্ত্রকে সীজারের ডিক্টেটারী ভেঙে দিয়েছিল আর সেই সঙ্ঘের কিছু সভ্য কয়েকটা প্রজাসমিতি গড়েছিল, তথাকথিত রাস্তার দল, সেগুলোও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন সেই সেক্রেটারী টিটুস রাফস শ্রমিক নেতাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে, তাদের প্রতিক্রিয়া বাজিয়ে দেখবার জন্ত।

সে তৎকালীন বাড়ী রঙ করার শ্রমিকদের সম্পাদকের সঙ্গে কথা বলল, তারপর সেকালের একজন ভোটের হুইপ-এর সঙ্গে, লোকটা এখন একটা রেস্তোরাঁর মালিক। দুজনকেই অত্যন্ত সাবধানী মনে হল, রাজনীতি প্রসঙ্গে কথা বলতে গররাজী। তারা সেই বৃদ্ধ কার্পোর কথা তুলল, তৎকালীন রাজমিস্ত্রীদের নেতা ছিল লোকটা, তার প্রভাবই সবচেয়ে বেশী, 'কারণ সে বন্দী'।

ইতিমধ্যে সীজারের কাছে মস্ত অতিথি এসেছে: ক্লেয়োপেত্রা। রানী সেই শঙ্কা আর সহ্য করতে পারেনি। তাকে জানতেই হবে, তার অবস্থাটা কি। মৃত্যুর জন্ত সাজ করেছে, মিশরের সমস্ত চারুতা প্রকাশ পেয়েছে, তিন মহাদেশে খ্যাত তার সৌন্দর্যকে কাজে লাগাতে। ডিক্টেটরের তাড়া আছে বলে মনে হল না। তাঁর ব্যবহার গত বছরগুলোতে সব সময়ে যেমন ছিল, স্বচ্ছন্দই বিনয়, সব সময়ে পরামর্শ দিতে প্রস্তুত। মাঝে মধ্যেই বুঝিয়ে দিচ্ছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তার প্রেমাস্পদ হতে পারেন, যদি সে তা চায়, রমণীয় সৌন্দর্যের অপরিসীম বিদগ্ধ ব্যক্তি, তিনি তাই। তবে রাজনীতি প্রসঙ্গে একটিও কথা নয়। দুজনে আট্রিউম-এ বসে সোনালী মাছগুলোকে খাওয়ালো, আবহাওয়া নিয়ে কথা বলল। তিনি ওকে গ্রীষ্মকালে তাঁর বাজ্যাতে নিমন্ত্রণ জানালেন…

ক্লেয়োপেত্রা শান্তি পেল না। ভাবল সীজার তখনো সংহার মূর্তি ধারণের যাবতীয় প্রস্তুতি সব শেষ করে উঠতে পারেনি, তাই বোধহয় প্রকৃত ঘটনা। ক্লেয়োপেত্রা গম্ভীর মুখে চলে গেল। সীজার তাকে সীভান অবধি পৌঁছে দিলেন, তারপর গেলেন সেইসব দপ্তরে, যেখানে আইনবিদ আর সেক্রেটারীরা,

পাগলের মত কাজ করছে নতুন ভোটের আইনের খসড়া তৈরী করবার জন্ত। খসড়া গোপন রাখতে হবে। প্রাসাদ ছেড়ে বাইরে যাবার অনুমতি কারো নেই। 'এই সংবিধান রোমে এ যাবৎ যা হয়েছে সেই সবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী উদার হবে।'

সমস্তই এখন অবশ্য নির্ভর করছে জনসাধারণের ওপর…

রাজন যে এতক্ষণ ধরে বাইরে রয়েছে—কি এমন কথাবার্তা বলবার থাকতে পারে, ডিক্টেটর তাদের যে অভূতপূর্ব সুযোগ দিচ্ছেন, শ্রমিকরা সেটা দুহাতে লুটে নেবে, এটাই তো ঠিক—, সীজার ঠিক করলেন, কুকুরের দৌড় দেখতে যাবেন। নিজে সাধারণ লোকেদের সংস্পর্শে আসবার প্রয়োজন তিনি বোধ করলেন, আর কুকুরের দৌড়ের মাঠেই জনতাকে পাওয়া যাবে। দর্শকদের আসন তখনো সম্পূর্ণ ভরে ওঠেনি। সীজার সেই বড় বক্সে না গিয়ে আরো ওপরে সাধারণ মানুষের মধ্যে গিয়ে বসলেন। তাঁকে চিনে ফেলতে পারে সে ভয় তাঁর বলতে গেলে নেই, লোকেরা তাঁকে সবসময়ে বহুদূর থেকে দেখেছে।

সীজার কিছু সময় দেখলেন, তারপর তিনিও একটা বিশেষ কুকুরের ওপর বাজি ধরলেন। তাঁর পাশে একটা লোক বসে, তিনি তাকে বললেন, কেন তিনি এই বিশেষ কুকুরটাকে বেছে নিয়েছেন। লোকটি মাথা নাড়ল। সামনের দিকে একটা সারি ওপাশে সামান্য ঝঞ্ঝাট হচ্ছে। কিছু লোক মনে হল ভুল জায়গায় বসে পড়েছে, নতুন যারা এসেছে তারা তাদের সেখান থেকে হটিয়ে দিল। সীজার চেষ্টা করলেন তাঁর পাশের লোকদের সঙ্গে গল্প করবার এমনকি রাজনীতি প্রসঙ্গেও। তারা এক কথায় উত্তর সারল, আর তখন তিনি বুঝতে পারলেন, ওরা জানে, তিনি কে: তিনি বসে আছেন তাঁর ছদ্মবেশী পুলিশদের মধ্যে।

বিরক্ত হয়ে তিনি উঠে পড়লেন, তারপর চলে গেলেন। যে কুকুরটার ওপর তিনি বাজি ধরেছিলেন, সেটি অবশ্য জিতেছিল…

মাঠের সামনে তাঁর দেখা হল সেই সেক্রেটারীর সাথে, সে তাঁকে খুঁজছে। সে সুখবর আনতে পারেনি। কেউ চুক্তি করতে চায় না। সর্বত্র হয় ভয় নয়তো ঘৃণা। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শেষেরটা। যে লোকটিকে সবাই বিশ্বাস করে সে কার্পো, সেই রাজবিদ্রোহী। সীজার হতাশ ভাবে শুনলেন। তিনি তাঁর সীডানে চাপলেন, বললেন তাঁকে মাম্যারটিন কারাগারে নিয়ে যেতে। তিনি কার্পোর সঙ্গে কথা বলবেন।

অবশেষে কার্পোকে খুঁজতে হল। সেকালের প্রচুর অধিক বন্দী এই খাঁচাগুলোর মধ্যে আছে, ডজনে ডজনে তারা এখানে পচে মরছে। কিন্তু অনেকক্ষণ এদিক ওদিক করবার পর সেই রাজমিস্ত্রী কার্পোকে একটা লম্বা দড়িতে বেঁধে একটা কোকর থেকে বার করে আনা হল। এবার ডিক্টেটর লোকটার সঙ্গে কথা বলতে পারেন, এই লোকটিকে রোমের জনগণ বিশ্বাস করে।

দুজনে মুখোমুখি বসে পরস্পরকে দেখল। কার্পোর বয়স হয়েছে, হয়তো সীজারের চেয়ে বয়সে বড় নয়, তবে তাকে অবশ্যই আশি বছরের বলে মনে হয়। বেশ বয়স, বেশ খারাপ স্বাস্থ্য, তবে ভেঙে পড়েনি। কোনো রকম ভণিতা না করে সীজার তাঁর নতুন পরিকল্পনার কথা খুলে বললেন, আবার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা, গণভোট ঘোষণা, নিজে অবসর নিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবার কথা, ইত্যাদি, প্রভৃতি।

বৃদ্ধ লোকটি চুপ করে থাকল। সে হ্যাঁ বলল না, সে না বলল না, সে চুপ করে রইল। সে কঠিন দৃষ্টিতে সীজারকে দেখল কিন্তু একটা শব্দও উচ্চারণ করল না। সীজার যখন চলে এলেন তখন তাকে সেই লম্বা দড়ি সমেত তার কোকরের মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হল। গণতন্ত্রের স্বপ্ন ভেঙে গেল। স্পষ্ট হল—তাঁর পতনের সময় ওরা কেউই এগিয়ে আসবে না। ওরা তাঁকে খুব ভাল ভাবে চেনে।

ডিক্টেটর তাঁর প্রাসাদে ফিরলে তিনি কে, সেকথা প্রহরীদের বুঝিয়ে বলতে তাঁর সেক্রেটারীরা খুব ঝামেলায় পড়েছিল। প্রহরীরা নতুন। পুলিশের নতুন প্রধান রোম্যান প্রহরীদের সরিয়ে দিয়েছে এবং তাদের জায়গায় একদল নিগ্রোকে প্রাসাদে এনে হাজির করেছে। নিগ্রোরা অনেক নিরাপদ, ওরা ল্যাটিন জানে না কাজেই সহজে ওদের উত্তেজিত করা যাবে না এবং শহরের হালচালে এদের ওপর কোনো প্রতিক্রিয়া পড়বে না। এবার সীজার জানলেন, শহরের হালচাল কেমন…

প্রাসাদে সেই রাতটা কাটল অস্বস্তির মধ্য দিয়ে। সীজার বহুবার বিছানা ছেড়ে উঠে বিশাল প্রাসাদের মধ্যে পায়চারি করলেন। নিগ্রোরা মদ খেয়ে গান গাইছে। কেউ তাঁকে খেয়াল করছে না, কেউ তাঁকে চিনতে পারছে না। তিনি ওদের একটা করুণ গান শুনলেন তারপর গেলেন আস্তাবলে, তাঁর প্রিয় ঘোড়াটাকে দেখতে। সেই ঘোড়াটা যাই হোক তাঁকে চিনতে পারল—। চিরকালের রোম অন্ধকারে ডুবে আছে। রাতের আস্তানা-

গুলোর তোরণের সামনে বিপন্ন প্রহরীরা তখনো দাঁড়িয়ে তিন ঘণ্টা ঘুমোবার আশায় আর প্রাচ্যদেশে অভিযানের বিবরণ দিয়ে সৈনিকরা যেসব পোস্টার ঝুলিয়ে ছিল, সেইসব আধছেঁড়া পোস্টার পড়ছিল, সেই অভিযান আর ঘটবে না। ক্যাপিটল তোরণের বাগানের গত রাতের প্রহরীরা সব উধাও। প্রাসাদগুলোর ভেতর থেকে মাতালের স্বর ভেসে আসছে। শহরের দক্ষিণের এক তোরণের মধ্য দিয়ে ছোট্ট একদল ঘোড়সওয়ার বেরিয়ে গেল: সম্পূর্ণ অবগুণ্ঠনে ঢাকা রানী ক্লেয়োপেত্রা রাজধানী ত্যাগ করল…। রাত্রি দুটোর সময় সীজারের কি মনে হল, বিছানা ছেড়ে উঠে রাতের পোশাকেই প্রাসাদের যে অংশে আইনবিদরা তখনো নতুন সংবিধান তৈরীর কাজে ব্যস্ত সেখানে গেলেন। তাদের ঘুমোতে পাঠালেন।

সকালের দিকে সীজারকে জানানো হল, তাঁর সেক্রেটারী রাস্কস সেই রাত্রে খুন হয়েছে। মনে হয় শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে তার আলোচনার কথা ফাঁস হয়ে গেছে আর অন্ধকারের ভেতর থেকে কঠোর হাতগুলো তৎপর হয়ে উঠেছে। কাদের হাত? রাস্কস-এর কাছে ষড়যন্ত্রকারীদের নামের যে তালিকা ছিল, সেটা উধাও।

সে প্রাসাদে খুন হয়েছে। অর্থাৎ ডিক্টেটরের সমর্থকদের পক্ষে এই প্রাসাদ আর নিরাপদ নয়। ডিক্টেটরের নিজের পক্ষে?

সীজার অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন ক্যাম্প খাটটার সামনে, তার ওপর মৃত সেক্রেটারীকে শোয়ানো, তাঁর শেষ বিশ্বস্ত লোক, বিশ্বস্ততার দাম হিসেবে দিতে হয়েছে তার প্রাণ।

ঘরটার থেকে বেরোবার সময় এক মাতাল প্রহরীর সঙ্গে তাঁর ধাক্কা লাগল, লোকটা মাপ চাইল না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবার সময় তিনি শঙ্কিতভাবে চারদিক দেখলেন।

আট্রিউম যেন অসহায় ভাবে পড়ে আছে—ডিক্টেটরের প্রাতঃকালীন সম্বর্ধনায় কেউ আসেনি।

আট্রিউম-এ দেখা হল আন্তোনিউস-এর দূতের সঙ্গে, কনসুল আর তার বিশ্বস্ত সমর্থক খবর পাঠিয়েছে, তিনি যেন আজ কোনো ক্রমেই সিনেটে না যান। তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নাকি বিপন্ন। সীজার আন্তোনিউসকে বলতে বললেন, তিনি সিনেটে যাবেন না।—তার বদলে তিনি তাঁকে ক্লেয়োপেত্রার বাড়ীতে নিয়ে যেতে বললেন, তাঁর প্রাসাদের সামনের প্রাত্যহিক

অভিযোগকারীদের লম্বা সারির পাশ দিয়ে। ক্লেওপেত্রা হয়তো তাঁর সৈন্য সমাবেশের খরচ যোগাবে? তাহলে তাঁর আর সিনেটকেও দরকার নেই, জনগণকেও না।

ক্লেওপেত্রা বাড়ী নেই। বাড়ী বন্ধ। মনে হল বেশ কিছুকালের জন্য বাইরে গেছে···।

আবার প্রাসাদে। মন্দির বিবর, তোরণ খোলা। জানা গেল, প্রহরীদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর অধিশ্বর নীচু হয়ে তাঁর সীডান থেকে নিজের বাড়ীর দিকে দেখলেন, সেখানে ঢোকবার সাহস আর নেই তাঁর।

আন্তোনিউস-এর কাছ থেকে একজন দেহরক্ষীর ব্যবস্থা তিনি করতে পারতেন। কিন্তু কোনো দেহরক্ষীকেই আর বিশ্বাস নেই। বরং দেহরক্ষী ছাড়াই যাবেন, তাহলে অন্তত তাকে ভয় পেতে হবে না। কোথায় যাবেন তিনি?

তিনি আদেশ দিলেন। তিনি সিনেটে যাচ্ছেন।

সীডানে হেলান দিয়ে বসলেন। ডাইনে বাঁয়ে কোনোদিকে তাকালেন না। পম্পেউস-এর পোর্টিকোতে নিয়ে যেতে বললেন। নামলেন। প্রার্থীদের ব্যবস্থা করলেন। মন্দিরে গেলেন। সিনেটরদের একজন বা অন্যজনকে খোঁজ করে এক ঝলক দেখে তাকে অভিবাদন জানালেন। তিনি তাঁর চেয়ারে বসলেন। কিছু অনুষ্ঠান সারা হল। এবার ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁর দিকে এগিয়ে এল. কি একটা অজুহাত তাদের। দুদিন আগে তাঁর স্বপ্নে দেখা সেই কাঁধের ওপর সাদা দাগ নয়; এদের সকলের মুখ আছে, তাঁর প্রিয়তম বন্ধুদের মুখ। কে একজন এগিয়ে দিল একটা কিছু পড়বার জন্য, তিনি সেদিকে হাত বাড়ালেন। ওরা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

২

সীজারের সৈনিক

সূর্য ওঠার আগে একটা গরুর গাড়ী বসন্তের সবুজ কাম্পানার মধ্য দিয়ে রোমের দিকে এগিয়ে আসছে। গাড়ীতে আছে বাহান্ন বছর বয়সের এক চাষী এবং এককালে সীজারের একজন প্রবীণ সমর্থক টেরেনটিউস ক্যাপ্যার, তার পরিবার এবং তাদের সংসারের যথাসর্বস্ব। ওদের সকলের মুখে চিন্তার

ছাপ। চাষের বেলায় তারে তাদের ভোট পাবার থেকে তাদের উৎখাত করা হয়েছে। একমাত্র আঠেরো বছরের লুকিলিয়া সেই বিশাল উদাসীন শহর দেখে মজা পাচ্ছে। তার ভাবী স্বামী সেখানে থাকে। শহরের দিকে এগোতে এগোতে তারা লক্ষ্য করল, বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। চেকপোস্ট-গুলোতে কড়াকড়ি অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রায়ই সেনাবিভাগের লোকেরা তাদের দাঁড় করাচ্ছে। গুজব শোনা যাচ্ছে, সামনে বিশাল এশিয়া অভিযানের আয়োজন। সেই প্রবীণ সৈনিক তাকে একসময়ে আশা দেওয়ার কথা ভেবে সেনাদলে নাম লেখাবার অফিস ঘরগুলোর খোঁজ করল, অত ভোরে সেগুলো ফাঁকা; সে প্রাণ ফিরে পেল। সীজার নতুন বিজয় অভিযানের পরিকল্পনা নিয়েছেন। টেরেনটিউস স্প্যার-এর পক্ষে ভালই হল। সেদিন ১৩ই মার্চ, খ্রীঃ পূঃ ৪৪।

সকাল ন'টা নাগাদ গরুর গাড়ীটা পম্পেউস-এর পোর্টিকোর ভেতর দিয়ে ঢুকল। অনেক লোক এখানে অপেক্ষা করছে। সীজার আসবেন আর সিনেটররা আসবে, মন্দিরে একটা বৈঠক বসবে, সেই বৈঠকে সিনেট 'ডিক্টেটরের এক জরুরী বিজ্ঞপ্তি' শুনবে, এইরকম কথা আছে। সর্বত্র যুদ্ধের কথা, স্প্যার কিন্তু অবাক হল, সেনাবাহিনীর লোকেরা সবাইকে সরে যেতে বলছে দেখে। সৈনিকরা উপস্থিত হলে প্রত্যেকটা বৈঠক নষ্ট হয়। সেই প্রবীণ তার গাড়ী ওর মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতেই ব্যস্ত। অর্ধেক পথ পার হয়ে সে তার গাড়ীর ওপর দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে চিৎকার করল, "সীজারের জয় হোক!" দেখে অবাক হল, কেউ তার ডাকে সাড়া দিল না।

একটু অস্বস্তির সঙ্গে সে তার পরিবারকে শহরতলির এক সস্তা হোটেলে এনে তুলল। তারপর বের হল তার ভাবী জামাই-এর খোঁজে। সে সীজারের সেক্রেটারী টিটুস রাফস। লুকিলিয়া সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, সে নিল না। সেই ছেলেটার সাথে তাকে প্রথমে 'একটা ফয়সালা করতে হবে"।

বুঝতে পারল, সীজারের প্রাসাদে সাধারণ ভাবে ঢোকা রীতিমত কঠিন। তলাশি, বিশেষ করে অস্ত্র ব্যাপারে, বেশ কড়া। হাওয়া গরম।

ভেতরে গিয়ে জানতে পারল, ডিক্টেটরের ডুশোরও বেশী সেক্রেটারী আছে। রাফসের নাম কেউ জানে না।

প্রকৃত পক্ষে গত তিন বছরের মধ্যে রাফস প্রাসাদের এই লাইব্রেরী মহলে তার মালিকের দেখা পায়নি। সে সীজারের সাহিত্য বিষয়ক সেক্রেটারী এবং

তাঁর সঙ্গে ব্যাকরণ নিয়ে কাজ করেছে। সেই কাজে আর হাত পড়েনি, এসব কাজের জন্য ডিক্টেটরের আর সময় নেই। সেই প্রবীণ সৈনিক যখন অতি কষ্টে লাইব্রেরীতে ঢুকল তখন তাকে দেখে রাফল আনন্দে আত্মহারা। কী, সুকিলিয়া এই রোমে? হ্যাঁ, সে এখানে, কিন্তু সেজন্য খুশি হওয়ার কোনো কারণ নেই। পরিবারটিকে পথে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেজন্য সুকিলিয়াই সবচেয়ে বেশী দায়ী। সে অনায়াসে জোতদারের কথা একটু শুনতে পারত, লোকটা চামড়া কারখানার মালিক…বিশেষ করে রাফল যখন আর একবারও দেখা দেয়নি। ছেলেটি খুব চেষ্টা করল নিজের অবস্থা বুঝিয়ে বলবার। সে ছুটি পায়নি। ওদের পরিবারকে সাহায্য করবার জন্য সে সব করবে। সে অফিস থেকে আগাম নেবে। টেরেনটিউস স্প্যাফার-এর জন্য সে তার সব জানাশোনা লোকেদের বলবে। প্রবীণ সৈনিক, সে যেন সেবাপতি হবে না, বিশেষ করে সামনে বড় যুদ্ধ!

করিডোরে পায়ের শব্দ আর তরবারির ঝঙ্কার. দরজা হঠাৎ খুলে গেল: দরজার চৌকাঠে সীজার দাঁড়িয়ে।

সাধারণ সেক্রেটারী উঠে দাঁড়াল আড়ষ্ট ভাবে, সেই বিশাল পুরুষ তাকে দেখছেন খুব খুঁটিয়ে। তিন বছর পর সীজার এলেন এই প্রথম তার কাজের ঘরে! সে ভাবতে পারছে না, 'তার দুর্ভাগ্য এই মাত্র এসে দাঁড়িয়েছে চৌকাঠে।'

ব্যাকরণের কাজে সীজার আসেননি। ঘটনা হচ্ছে, তিনি একজন লোক খুঁজছেন যাকে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন, অর্থাৎ এমন একজন যাকে এই প্রাসাদে সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। লাইব্রেরীর পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁর এই সাহিত্য বিষয়ক সেক্রেটারীর কথা মনে পড়ে, একজন যুবক, যার সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। তাহলে হয়তো একে এখনো ঘুষ দেওয়া হয়নি…

দুজন দেহরক্ষী স্প্যাফারকে তল্লাশ করল, অস্ত্র আছে কিনা, তারপর তাকে বার করে দিল। সে গর্বিতভাবে চলে গেল; তার ভাবী জামাই তাহলে দেখা যাচ্ছে এই প্রাসাদের নিতান্ত সাধারণ লোক নয়। মহান সীজার তার খোঁজে আসেন, সেটা শুভ লক্ষণ।

রাফলকেও তল্লাশ করা হল, অস্ত্র আছে কিনা। তারপর কিন্তু সীজার তাকে একটা কাজের ভার দিলেন। তাকে স্পেন দেশের বিশেষ একজন

ব্যাঙ্কারের কাছে যেতে হবে, সবচেয়ে ভাল হয় ঘুর পথে গেলে, তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে জেনে আসতে হবে, 'সীজারের' প্রাচ্যদেশ বিজয় অভিযানের আয়োজনে শহরে যে বিস্ময়কর বিরোধিতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তার উৎস কোথায়।

এদিকে প্রবীণ লোকটি প্রাসাদের সামনে যুবকের অপেক্ষায় রয়েছে। সে যখন একলা,—আসলে যুবকটি পেছনদিকের একটা পথে বেরিয়ে গেছে—ক্যাপ্যার চলে গেল, তার পরিবারকে এই শুভ সূচনার খবরটা দিতে হবে। পথে একটা অফিস পড়ল, সেখানে সেনাদলে নাম লেখানো হচ্ছে। কেবল যুবকরা নাম লেখাচ্ছে। নিরাপদ থাকা, সেনাপতি হওয়া ভালই হবে। সৈনিক হবার বয়স আর তার নেই।

এবার কয়েকটা মদের দোকানে চক্কর মারল, শহরতলির ছোট্ট হোটেলটায় যখন গিয়ে পৌছুল তখন তার একটুখানি নেশাবস্ত হয়েছে। সে এখন রীতিমত সেনাপতি টেরেনটিউস ক্যাপ্যার, আর তার বিরক্তি গিয়ে পড়ল লুকিলিয়ার সেই যুবকটির ওপর, সে এখনো এসে পৌছয়নি। সেক্রেটারী মশাই এখন এত বড় একজন যে তার নিজের ভাবী স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবারও সময় নেই? এদিকে এই পরিবারের চলবে কিসে? এই মুহূর্তে অন্তত তিনশো সেস্টার্জি দরকার। লুকিলিয়াকে মাথা ঠাণ্ডা করতে হবে, সেই চামড়ার কারখানার মালিককে খুঁজে বার করতে হবে, তার কাছ থেকে ঐ তিনশো সেস্টার্জি ধার নিতে হবে। লুকিলিয়া কাঁদছে। রাকস আসবে না, এটা ও বুঝতে পারছে না। পাম্পিলিউস তাকে ঐ তিনশো সেস্টার্জি দিতে দ্বিধা করবে না, তবে সে তা অমনি অমনি করবে না। লুকিলিয়ার বাবা খুব রেগে গেছে। আর কোনো সন্দেহই নেই যে সেই ছোকরা আর 'এপথে আসবে' না। ওকে চুলোর দোরে পাঠানোর দরকার। ওকে জানানো চলবে না যে সবাই ওর ভরসায় বসে আছে। ওকে দেখিয়ে দিতে হবে, অন্য লোকও আছে। লুকিলিয়ার দাম তারা জানে। লুকিলিয়া কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল, তখনো আশা, রাকসের দেখা পেতে পারে।

সেই মুহূর্তে রাকস প্রাসাদে ফিরেছে। স্পেসীর সেই ব্যাঙ্কারের কাছ থেকে সে একটা ফাইল পেয়েছে, সেটা সীজারের হাতে তুলে দিল। এবার অফিসে গিয়ে কিছু আগাম নেবার চেষ্টা করল। সেখানে সে গভীর আঘাত পেল। আগাম তো পেলই না, উপরন্তু তাকে জোয়ার পাল্লায় পড়তে হল।

কুথাই তার মালিকের খোঁজ করল, অবশেষে বিকেলে বেশ গড়িয়ে গেলে তাঁর দেখা পেল মার্কাসে কুকুরের দৌড়ের ওখানে। প্রাসাদে ফেরবার পথে সে সীজারকে জানাল সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর হঠাৎ তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল কি সাংঘাতিক বিপদ ঘনিয়ে আসছে ডিক্টেটরের, সে তখন দিশেহারা হয়ে প্রস্তাব করল: সীজারের উচিত হবে সেই রাত্রেই গোপনে শহর ত্যাগ করা আর চেষ্টা করা, কর্ফিনিউম অবধি পৌঁছনো, যাতে সেখান থেকে জাহাজে চেপে আলেকজান্দ্রিয়াতে তাঁর সেনাদলের ওখানে পৌঁছতে পারেন। সে কথা দিল, তাঁর জন্য একটা গরুর গাড়ী তৈরী রাখবে।—ডিক্টেটর হতোভম্ব অবস্থায় তাঁর সোফাতে হেলান দিয়ে বসে, তার কথার উত্তর দিলেন না।

রাকস কিন্তু ঠিক করে ফেলেছে, এই পলায়নের সব ব্যবস্থা করবে। সেই বিশাল, অশান্ত, গুজবে সশঙ্ক রোমের ওপর যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে তখন সে দক্ষিণের পোর্টিকোর প্রহরীর সঙ্গে ঘুষের অঙ্ক নিয়ে কথা বলছে। ভেতরে ঢোকবার অনুমতি পত্র ছাড়াই গরুর গাড়ীটা মধ্যরাত্রির পর ভেতরে ঢুকবে। তার কাছে যা ছিল সব সে প্রহরীকে দিল। পুরো তিনশো সেস্টার্সি।

ন'টা নাগাদ সে গিয়ে হাজির হল সেই হোটেলে ক্যাপ্যারদের ওখানে। সে লুকিলিয়াকে জড়িয়ে ধরল। পরিবারের আর সবাইকে অনুরোধ করল, টেরেনটিউস ক্যাপ্যারের সঙ্গে একা কথা বলতে দিতে। তারপর সে সেই প্রবীণের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "সীজারের জন্য তুমি কী করতে পার?"

"চাষের জমির ব্যাপারটার অবস্থাটা কিরকম?" ক্যাপ্যার জিজ্ঞাসা করল।

"তার বারোটা বেজে গেছে", বলল রাকস।

"আর সেনাপতির চাকরিটারও বারোটা বেজে গেছে?" জিজ্ঞাসা করল ক্যাপ্যার।

"সেনাপতির চাকরিটারও বারোটা বেজে গেছে", বলল রাকস।

"কিন্তু, তুমি এখনো তাঁর সেক্রেটারী?"

"হ্যাঁ।"

"তাঁর সঙ্গে দেখা হয়?"

"হ্যাঁ।"

"আর তুমি তাঁকে দিয়ে আমাদের একটা ব্যবস্থা করিয়ে দিতে পার না?"

"কারো কোনো উপকার করবার ক্ষমতা তাঁর আর নেই। সব ওলট-পালট হয়ে গেছে। কাল তাঁকে একটা ইঁদুরের মত মেরে ফেলা হবে। এবার বল, তাঁর জন্ত তুমি কী করতে চাও?" প্রশ্ন করল সেক্রেটারী।

সেই বুড়ো লোকটি অবিশ্বাসের সঙ্গে দেখল তাকে খুঁটিয়ে। মহান সীজার শেষ? এমন অবস্থা তাঁর যে টেরেনটিউস ক্যাস্পারের সাহায্য দরকার তাঁর?

"কিভাবে আমি তাঁকে সাহায্য করতে পারি?" জিজ্ঞাসা করল ক্যাস্পার।

"আমি তাঁকে তোমার গরুর গাড়ীটা দেব বলেছি," সেক্রেটারী বলল শান্তভাবে। "তোমাকে মধ্য রাত্রির পর থেকে দক্ষিণের পোর্টিকোতে তাঁর অপেক্ষায় থাকতে হবে।"

"আমাকে গাড়ী নিয়ে ওরা ঢুকতে দেবে না।"

"দেবে। সেজন্ত আমি ওদের তিনশো সেস্টার্জি দিয়েছি।"

"তিনশো সেস্টার্জি? আমাদের?"

"হ্যাঁ।"

বুড়ো লোকটি প্রায় বিরক্ত ভাবে তার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখল অবাক হয়ে। তারপর তার দৃষ্টিতে এল অর্ধেক জীবন বার বার অভ্যস্ত লোকটির দুরবস্থার অনিশ্চয়তা। তারপর বিড়বিড় করতে করতে সরে গেল।

বিড়বিড় করে বলল, "হয়তো অন্য যে কোনো কাজের মতই এটা একটা ভাল কাজ। পালাতে পারলে তিনি প্রতিশোধ নিতে পারবেন।"

তাঁর জীবনের প্রকৃত অবস্থায় ফিরতে পারলে তাঁর আবার 'আশা' আছে।

লুকিলিয়াকে বোঝানো বেশ শক্ত হল র‍্যাকসের পক্ষে। ও রোমে র‍্যাকসকে আবার দেখার পর থেকে ওরা কখনো একা হতে পারেনি। র‍্যাকস বা ওর বাবা কেউই ওকে বলেনি, এতদিন কোন কাজে সে সবসময়ে ব্যস্ত ছিল। এবার ও তা জানতে পারল। তার ভাবী স্বামী সীজারের সঙ্গী। সে-ই পৃথিবীর শাসকের একমাত্র বিশ্বস্ত লোক।

কিন্তু সে কি লুকিলিয়ার সঙ্গে পনেরো মিনিটের জন্যও হুপ্‌ক্যারন্সী-ভপায়লেতে একটা রেস্তোরাঁয় যেতে পারে না? পনেরো মিনিট সীজার একা থাকতে পারবেন না?

র‍্যাকস তাকে নিয়ে হুপ্‌ক্যারন্সীভপায়লেতে গেল। কিন্তু তাদের কোনো রেস্তোরাঁয় যাওয়া হল না। র‍্যাকস হঠাৎ লক্ষ্য করল, তার পেছনে আবার

লোক লেগেছে। দুজন সন্দেহজনক লোক তার পেছনে লেগে আছে, যেখানেই সে যাক না কেন, সেই সকাল থেকে। কাজেই দুই প্রেমাস্পদ হোটেলের সামনেই আলাদা হয়ে গেল। লুকিলিয়া তার মায়ের কাছে গিয়ে জানতে আত্মহারা হয়ে জানাল, রাকস মহান সীজারের কত নিকট লোক।

এদিকে রাকস অনুসরণকারীদের হাত থেকে রেহাই পাবার বৃথা চেষ্টা করল।

মধ্যরাত্রির আগে সে জানতে পারবে, ক্ষমতাশালীদের সংস্পর্শে আসবার অর্থ কি।

এগারোটা নাগাদ রাকস আবার পৌছুল প্রাসাদের চত্বরে। একদল নিগ্রো প্রাসাদ পাহারার ভার নিয়েছে। বেশীর ভাগ সৈনিকই মাতাল।

সাইবেরীতে তার ছোট্ট ঘরে সে উন্মাদের মত সেই ফাইলটা উল্টে দেখল, ফাইলটা সেই স্পেনীয় ব্যাঙ্কার একদিন আগে সীজারকে দেবার জন্য তার হাতে দিয়েছিল। সীজার ওটা পড়ে দেখেন নি। এই ফাইলের মধ্যে রয়েছে ষড়যন্ত্রকারীদের নাম। সে সেই সমস্ত নাম খুঁজে পেল। ব্রুটাস, ক্যাসিয়াস, রোমের সামন্ত জোনেস তোরে, সীজার যাদের বন্ধু বলে মনে করে তাদের অনেকে। সীজারকে এই ফাইল পড়তেই হবে, এই মুহূর্তে, এই রাতেই। সে তাঁকে বুঝিয়ে রাজী করবে, টেরেনটিউস ব্যাপ্যারের শকর গাড়ীতে গিয়ে বসতে।

সে ফাইলটা নিয়ে রওনা হল। করিডোরগুলো সব আবছা অন্ধকার, প্রাসাদের অন্য মহল থেকে মাতালদের গান ভেসে আসছে।

আট্রিউম-এর প্রবেশ পথে দুই বিশাল নিগ্রো পাহারা দিচ্ছে। তারা তাকে ভেতরে যেতে দিতে চায় না। তার কথা ওরা বোঝে না।

আরেক দিক থেকে সে চেষ্টা করল। প্রাসাদটা বিশাল। এখানেও নিগ্রো প্রহরী এবং প্রবেশ নিষেধ। করিডোরগুলো আর সামনের বাগান-গুলোতে চেষ্টা করল, জানালা টপকে যদি যাওয়া যায়। কিন্তু সব বন্ধ।

ক্লান্ত হয়ে নিজের ঘরে ফেরবার পথে তার মনে হল, করিডোরের আরেক প্রান্তে একজনের পেছনটা যেন চিনতে পারল। তার পেছনে যারা লেগে ছিল, তাদের একজন।

আতঙ্কিত ভাবে সে ছুটে ঢুকে পড়ল নিজের ঘরে, দরজা বন্ধ করে দিল। আলো জ্বালল না, জানলা দিয়ে দেখল বাইরের আঙিনা। সেখানে তার

জানালার সামনে বসে আছে দ্বিতীয় লোকটি। ঠাণ্ডা ঘামে সে ভিজে উঠল।

সে অনেকক্ষণ বসে রইল অন্ধকার ঘরে, কান পেতে রইল। একবার দরজায় টোকা পড়ল। রাফস খুলল না। কাজেই যে লোকটা তার দরজার সামনে কিছু সময় অপেক্ষা করে আবার চলে গেল, তাকে সে দেখল না—সীজার।

মধ্যরাত্রির পর থেকে টেরেনটিউস ব্যাপ্যারের গরুর গাড়ী দক্ষিণের পোর্টিকোর সামনে দাঁড়িয়ে রইল। সেই অভিজ্ঞ সৈনিক তার স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েকে শুধু বলে এসেছে, তাকে এক জায়গায় যেতে হচ্ছে, দু'চার দিন রোমের বাইরে থাকতে হবে। সুকিলিয়া আর তার মা যেন রাফসের ওখানে যায়, সে তাদের ব্যবস্থা করবে।

যাই হোক সেই রাত্রে কেউ দক্ষিণের পোর্টিকোতে গরুর গাড়ীতে উঠে বসতে এল না।

১৫ই মার্চ ভোরে ডিক্টেটরকে জানান হল, রাত্রে তাঁর সেক্রেটারী প্রাসাদের মধ্যে খুন হয়েছে। ষড়যন্ত্রকারীদের নামের তালিকা উধাও। সেইসব নাম যাদের, তাদের সঙ্গে সীজারের দেখা হবে সকালে সিনেটে আর তাদের ছোরার আঘাতে তিনি জর্জরিত হবেন।

একজন প্রবীণ সৈনিক এবং দুর্দশাগ্রস্ত চাষী একটা গরুর গাড়ী চালিয়ে শহরতলির এক হোটেলে ফিরে আসবে, সেখানে একটা ছোট্ট পরিবার অপেক্ষা করবে, সেই পরিবারের কাছে মহান সীজারের ঋণের পরিমাণ তিনশো সেস্টার্জি···

লা সিওতাৎ-এর সেই সৈনিক

দক্ষিণ ফ্রান্সের ছোট্ট বন্দর লা সিওতাতে জাহাজের মিলে রেস্ উপলক্ষে এক উৎসব হয় প্রতি বছর। প্রথম মহাযুদ্ধের পর আমরা সেই মেলায় এক খোলা জায়গায় ফরাসী সৈন্য বাহিনীর এক সৈনিকের ব্রোঞ্জের পূর্ণ মূর্তি দেখতে পাই, সবাই ভীড় করে সেই দিকে যাচ্ছিল। আমরা এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, ওটি একটি জীবন্ত মানুষ, স্থির ভাবে বেটে রঙের ওভারকোট গায়ে, লোহার হেলমেট মাথায়, বেয়োনেট হাতে জুন মাসের প্রখর রোদ্দুরে একটা পাথরের বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে। তার মুখ এবং হাতদুটি ব্রোঞ্জের রঙ দিয়ে রাঙানো। তার কোনো পেশী নড়ছিল না, এমনকি তার চোখের পলকও পড়ছিল না।

তার পায়ের কাছে বেদীতে এক টুকরো পিচবোর্ড হেলান দিয়ে রাখা, তার ওপর লেখা আছে :

মূর্তি মানুষ

"আমি, চার্লস লুই ক্লানসার্ড, · তম রেজিমেন্টের সৈনিক, ভার্দে'র কাছে আহত হইয়া যাইবার পর হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ স্থির অবস্থায় রাখিবার এবং ইচ্ছামত সময় 'একটা মূর্তির মত' রাখিবার এক অস্বাভাবিক ক্ষমতা অর্জন করিয়াছি। আমার এই ক্ষমতা অনেক অধ্যাপক কর্তৃক পরীক্ষিত এবং একটি ব্যাখ্যাহীন রোগ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া একটি বেকার কিন্তু পরিবার পালককে সামান্য সাহায্য করুন।"

সেই বোর্ডের পাশে রাখা একটা থালার ওপর একটা মুদ্রা ফেলে দিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে অন্যদিকে গেলাম।

ভাবছিলাম, এখানে তাহলে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, সম্পূর্ণ ভাবে অস্ত্র সজ্জিত এক অবিনশ্বর সৈনিক, কয়েক হাজারের মধ্যে একজন, যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, যে আলেক্সাণ্ডার, সীজার, নেপোলিয়ন-এর সব মহৎ কীর্তিকে সম্ভব করেছে, আর সেসব কথা আমরা স্কুলের পাঠ্য পুস্তকে পড়ি। এই সে।

এর চোখের পলক পড়ে না। এই সেই সার্গন-এর বর্মধর, কাদিশ-এর অশ্বসজ্জিত রথের সারথী, যাকে মরুভূমির বালু সম্পূর্ণভাবে কবর দিতে পারেনি, সীজারের সৈনিক, চেঙ্গিস খান-এর বল্লমধারী অশ্বারোহী, চতুর্দশ লুডভিগ-এর সেই সুইস লোকটি এবং প্রথম নেপোলিয়ন-এর গোলন্দাজ। এ সেই ক্ষমতার অধিকারী, যা আদতে যেমন অস্বাভাবিক নয়, নিজেকে যাবতীয় বিধ্বংসী অস্ত্র-শস্ত্র তার ওপর পরীক্ষিত হলেও উপেক্ষিত রাখতে পারে। এ পাথরের মত, অচেতন (সে বলে), মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলেও অবিচল। প্রস্তর-যুগ, ব্রোঞ্জ-যুগ, লৌহ-যুগ, এই সব বিভিন্ন যুগের বর্শার আঘাতে বিদ্ধ; আরটাক্সার্স-এর এবং জেনারেল লুডেনডর্ফ-এর যুদ্ধযানে পিষ্ট; হানিবাল-এর হাতির পায়ের আর আত্তিলার ঘোড়সওয়ার দলের খুরের তলায় ক্ষত-বিক্ষত, বহু শতাব্দীর উন্নততর অস্ত্রের উড়ন্ত ধাতব পদার্থে ধ্বংসীভূত, আবার প্রাচীন ক্ষেপণাস্ত্রের পাথরে, বন্দুকের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে, তাদের কোনোটা পায়রার ডিমের সমান, কোনোটা মৌমাছির, দাঁড়িয়ে আছে. অবিনশ্বর, বারেবারেই নতুন করে, বহু ভাষায় আদেশ পেয়ে, কিন্তু সব সময়েই কেন বা কি জন্য তা না জেনে। যে সমস্ত দেশ সে জয় করেছে সেগুলো সে অধিকার করেনি, যেমন রাজমিস্ত্রী তার তৈরী বাড়ীতে বাস করে না। যে দেশ সে রক্ষা করেছে সেটাও তার নয়। এমন কি তার অস্ত্র বা সজ্জা তার নিজের নয়। কিন্তু সে দাঁড়িয়ে আছে, তার ওপর উড়োজাহাজের মৃত্যু-বর্ষণ আর নগর প্রাচীরের জলন্ত দুর্ভাগ্য, তার পায়ের তলায় মাইন আর ফাঁদের গর্ত, তার চারদিকে জীবাণু আর হলুদ ঢেড়াকাটা গ্যাস, বর্শা আর তীরের রক্তমাংসের টোপ, লক্ষ্যবিন্দু, ট্যাঙ্কের মণ্ড, গ্যাসের স্টোভ, তার সামনে শত্রু, পেছনে জেনারেল!

অসংখ্য হাত, সেগুলো তার কোট বুনেছিল, অস্ত্র তৈরী করেছিল, বুটজুতো বানিয়েছিল! অসংখ্য থলে, সেগুলো তার সাহায্যে বোঝাই হয়েছিল! দুনিয়ার 'যাবতীয়' ভাষায় অপরিমেয় আর্তনাদ তাকে উত্তেজিত করেছে! তাকে আশীর্বাদ করবার জন্য কোনো ঈশ্বর নেই! তাকে ধৈর্যের অখণ্ড কুষ্ঠ আক্রমণ করেছে, অচেতনতার সেই চিকিৎসার অসাধ্য রোগ অন্তঃসারহীন করে দিয়েছে!

কেমন সেই আচ্ছন্নতা, আমরা ভাবছিলাম, যার ফলে তার এই দশা, এই ভয়ঙ্কর, প্রচণ্ড, এমন নিদারুণ ছোঁয়াচে রোগ?

আমাদের মধ্যে প্রশ্ন জাগছিল, এর চিকিৎসা কি সত্যিই নেই?

আহত সক্রেটিস

ধাই-এর ছেলে সক্রেটিস তাঁর কথাবার্তায় বন্ধুদের মধ্যে খুব ভালভাবে, সহজে এবং নির্ভয় ঠাট্টার মাধ্যমে সুন্দর চিন্তাধারার বিকাশ ঘটাতে পারতেন এবং অন্যান্য শিক্ষকদের মত তাদের বেজন্মা না ভেবে নিজের সন্তানদের মত ব্যবহার করতেন। তিনি গ্রীকদের মধ্যে শুধু সবচেয়ে বুদ্ধিমান বলেই গণ্য ছিলেন না, একজন অন্যতম সাহসী বলেও গণ্য ছিলেন। যখন আমরা প্লেটো পড়তে গিয়ে দেখি তাঁর কৃতকর্মের স্বীকৃতি হিসেবে অবশেষে ওপরওয়ালার পাঠানো হেমলক-এর পাত্র কেমন সহজে এবং অনায়াসে নিঃশেষ করেছিলেন, তখন তাঁর সাহসী নাম প্রতিষ্ঠিত বলেই আমাদের মনে হয়। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল লোকেদের মধ্যে কয়েকজন কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর সাহসের কথাও বলা প্রয়োজন বলে মনে করেন। তিনি প্রকৃত পক্ষে ডেলিওম-এর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, এবং তাও সামান্য অস্ত্রে সজ্জিত পদাতিক বাহিনীতে, কারণ জাতিতে তিনি ছিলেন মুচি এবং বুদ্ধিতে দার্শনিক, অর্থাৎ উপার্জনের হিসেবে মূল্যবান অস্ত্রে সজ্জিত হবার অধিকার তাঁর ছিল না। যাই হোক, ভেবে দেখলে বোঝা যায়, তাঁর সাহসিকতা ছিল এক বিশেষ ধরনের।

যুদ্ধের দিন সকালে সক্রেটিস সেই রক্তারক্তির কারবারের জন্য যথা সম্ভব প্রস্তুত হয়েছিলেন, সেজন্য পেঁয়াজ চিবিয়েছিলেন, সৈনিকদের ধারণা, তাতে সাহস বাড়ে। বহু ব্যাপারে তাঁর বিচার ফল অন্য অনেক ব্যাপারে তাঁকে সরল বিশ্বাসী করে তুলেছিল; তিনি ধারণার বিরোধী এবং প্রকৃত অভিজ্ঞতায় বিশ্বাসী ছিলেন; আর তাই ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না, তবে পেঁয়াজে কিন্তু বিশ্বাস করেছিলেন।

আপ্‌সোসের কথা প্রকৃত কোনো ফল তিনি টের পাননি, অন্ততপক্ষে তৎক্ষণাৎ কোনো ফল তিনি পাননি; কাজেই মনমরা ভাবে তলোয়ার বাহিনীর সঙ্গে নিতান্ত যেতে হয় তাই রওনা হলেন, সবাই মিলে রাখালদের মত হেলে দুলে কোনো একটা ফসল কেটে নেওয়া মাঠের দিকে রওনা হল যুদ্ধের জন্য

প্রস্তুত হতে। তাঁর আগে এবং পেছনে এথেন্স-এর শহরতলির দুই যুবক, তারা তাঁকে জানায়, এথেন্স-এর কামারশালায় তৈরী ঢালগুলো তাঁর মত মোটা লোকের পক্ষে বড্ড ছোট করে কাটা। তাঁর নিজের ধারণাও তাই ছিল। শুধু তাঁর কাছে 'চওড়া' লোক ছিল, যাদের আধখানাও ঐ ঢালে ঢাকা পড়ত না, হাসির খোরাক হত।

সামনের এবং পিছনের লোকের সঙ্গে সেইসব বড় বড় অস্ত্র কারবারীর এরকম অত্যন্ত ছোট ঢাল তৈরীতে কত লাভ হতো সেই আলোচনায় বাধা পড়ল 'তাঁবু খাটাবার' হুকুমে।

সবাই সেই ফসলের খোঁচা খোঁচা মূলের ওপর বসে পড়ল, একজন সেনাপতি এসে সক্রেটিসকে সাবধান করে দিল, কারণ তিনি তাঁর ঢালের ওপর বসবার চেষ্টা করেছিলেন। গুপ্তচর যা পারেনি তার চেয়ে বেশী অস্বস্তিতে পড়েছিলেন তিনি সেই চাপা গলার স্বরে।

শত্রুপক্ষ কাছাকাছি কোথাও আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছিল।

সকালের সাদাটে কুয়াশা কিছু দেখতে দিচ্ছিল না। পায়ের শব্দ আর অস্ত্রের ঝংকারে তবুও বোঝা যাচ্ছিল, ওই জায়গা অধিকৃত।

একান্ত অনিচ্ছা সত্বেও সক্রেটিসের একটা আলোচনার কথা মনে পড়ল। আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় সেই আলোচনা হয়েছিল এক সম্ভ্রান্ত যুবকের সঙ্গে, তার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল গোপনে, আর সে অশ্বারোহী দলে অফিসার।

"একটা দারুণ পরিকল্পনা!" বলেছিল সেই যুবক পুতুলটি। "পদাতিক বাহিনী স্রেফ দাঁড়িয়ে থাকবে বিন্যস্ত এবং অনড়ভাবে আর শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করবে। আর এদিকে অশ্বারোহীরা এগিয়ে যাবে ঢালু জমির দিকে, ওদের পেছন দিক থেকে আঘাত হানবে।"

ঢালু জমিটা ডানদিকে বেশ খানিকটা দূরে, কুয়াশার মধ্যে কোথাও হবে। বোধহয় অশ্বারোহীরা সেদিকেই তখন রওনা হয়েছে।

পরিকল্পনাটা সক্রেটিসের ভালই মনে হয়েছিল, অন্তত পক্ষে খারাপ মনে হয়নি। সবসময়েই তো পরিকল্পনা করা হয়, বিশেষ করে শত্রুপক্ষের চেয়ে দুর্বল হলে। আসলে তখন স্রেফ যুদ্ধ হয়, অর্থাৎ আঘাত করা হয়। আর পরিকল্পনা কি ছিল তা নিয়ে কেউ ভাবে না; শত্রুপক্ষ যেখানে এগোতে দেয়, সেইদিকেই এগোনো হয়।

তখন সেই ভোরের আলোয় সক্রেটিসের কাছে পরিকল্পনাটা নিতান্তই

বাজে মনে হল। পদাতিক বাহিনী শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করবে—তার অর্থ কি? সাধারণভাবে কোনো আক্রমণ এড়িয়ে যেতে পারলেই খুশী হবার কথা, আর এখন কাজটা দাঁড়াচ্ছে আক্রমণ প্রতিরোধ করা! প্রধান সেনাপতি নিজে যে একজন অশ্বারোহী সেই ব্যাপারটা বেশ খারাপ।

সাধারণ একজন মানুষের যত পেঁয়াজ দরকার, তত পেঁয়াজ বাজারে পাওয়া যায়নি।

আর কেমন এক অস্বাভাবিক ব্যাপার, এই সকালে কোথায় বিছানায় শুয়ে থাকবে, তা না, এক মাঠের মধ্যিখানে মাটির ওপর বসে থাকা, আর সারা গায়ে অন্তত দশ পাউণ্ড লোহা আর হাতে একটা মানুষকাটা ছুরি। শহর আক্রান্ত হলে তাকে রক্ষা করতে হবে, একথা ঠিক, কারণ তা না হলে সেখানে যথেষ্ট ঝামেলা হবে। কিন্তু শহর আক্রান্ত হবে কেন? কারণ জাহাজের মালিকরা, আঙুর বাগানের মালিকরা আর ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা এশিয়ার পার্শী জাহাজের মালিক, আঙুর বাগানের মালিক আর ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের স্বার্থে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে! চমৎকার কারণ!

হঠাৎ সবাই যেন আতঙ্কিত হয়ে উঠল।

বাঁদিকের কুয়াশার ভেতর থেকে একটা প্রচণ্ড চিৎকার ভেসে এল, সেই সঙ্গে ধাতব শব্দ। বেশ দ্রুত এগিয়ে আসছে। শত্রুপক্ষের আক্রমণ শুরু হয়েছে।

বাহিনী উঠে দাঁড়াল। বিস্ফারিত চোখে কুয়াশার মধ্যে দেখতে চেষ্টা করল। দশ পা দূরে একপাশে একজন হাঁটু ভেঙে পড়ল আর অস্পষ্ট স্বরে ঈশ্বরের নাম নিল। সক্রেটিসের মনে হল, বড্ড দেরী হয়ে গেছে।

হঠাৎ আরো ডানদিক থেকে একটা ভয়ঙ্কর চিৎকার শোনা গেল, যেন উত্তর এল। সাহায্যের আশায় করা চিৎকারটা মনে হল মরণ যন্ত্রণার চিৎকারে পরিণত হল। সক্রেটিস দেখলেন, কুয়াশার ভেতর থেকে একটা লোহার ডাণ্ডা উড়ে আসছে। একটা বর্শা!

এবার সামনের দিকে কুয়াশায় ঝাপসা বিশাল বিশাল চেহারা ভেসে উঠল—শত্রু।

সক্রেটিসের নিশ্চিত ধারণা হল, হয়তো বড্ড বেশী সময় নষ্ট করা হয়ে গেছে, আনাড়ীর মত ঘুরে দৌড় শুরু করলেন। বর্ম আর ভারী পা-ঢাকার জন্য বেশ অসুবিধা সৃষ্টি করছিল। ঢালের চেয়ে ওগুলো অনেক বিপজ্জনক, ওগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যায় না।

দার্শনিক দৌড় দিচ্ছে কসনকাটা মাঠের ওপর দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে। সব কিছু নির্ভর করছে যথেষ্ট দূরত্বে এগিয়ে যাবার ওপর। আশা, অনুগত যুবকরা পিছনে কিছু সময়ের জন্য আক্রমণ প্রতিহত করবে।

হঠাৎ একটা জঘন্য ব্যথা অনুভব করলেন। তাঁর বাঁ পায়ের পাতা জ্বলে যাচ্ছে, তাঁর মনে হল, তিনি আর লড়াই করতে পারবেন না। আর্তনাদ করে বসে পড়লেন, কিন্তু নতুন করে যন্ত্রণায় কাতরে আবার উঠে দাঁড়ালেন। পাগলের মত তাঁর চারদিকে তাকিয়ে সব বুঝতে পারলেন। একটা কাঁটা-ঝোপের মধ্যে এসে পড়েছেন!

ছোট ছোট কাঁটাঝোপ, ভয়ঙ্কর সব ছুঁচোলো কাঁটায় বোঝাই। পায়েও নিশ্চয় একটা কাঁটা বিঁধেছে। দুচোখে জল, সাবধানে বসবার মত একটা জায়গা খুঁজে বার করতে চেষ্টা করলেন। অন্য পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে কয়েক পা চক্কর দিয়ে একটা জায়গায় বসলেন। কাঁটাটা তক্ষুণি বার করে ফেলতে হবে।

উত্তেজিত অবস্থায় শুনতে পেলেন যুদ্ধের হল্লা। দুপাশের বেশ খানিকটা জায়গা, দূর থেকে সেই আওয়াজ আসছে, তবে সামনের দিকে অন্ততপক্ষে একশো পা দূরে। যাই হোক মনে হল শব্দ এগিয়ে আসছে, ধীরে ধীরে তবে নির্ভুল ভাবে।

সক্রেটিস স্যাণ্ডেলটা খুলতে পারলেন না। কাঁটাটা পাতলা চামড়ার সোলের মধ্য দিয়ে ঢুকে গিয়ে মাংসের মধ্যে বেশ খানিকটা ঢুকে গেছে। কেমন সৈনিকরা মাতৃভূমি রক্ষা করবে তাদের যে কি করে এত পাতলা জুতো দিতে পারে! স্যাণ্ডালে চাপ পড়লেই একটা জলন্ত ব্যথা টের পাওয়া যাচ্ছে। বিমর্ষ ভাবে সেই বেচারী তাঁর চওড়া কাঁধ সঙ্কুচিত করলেন। কি করবেন?

তাঁর বিষন্ন চোখ পড়ল পাশের তলোয়ারের ওপর। তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলল, যে কোনো বিতর্কমূলক আলোচনার চেয়ে উৎসাহজনক। তলোয়ারটা ছুরি হিসেবে ব্যবহার করা যায় না? ওটার দিকে তিনি হাত বাড়ালেন।

সেই মুহুর্তে শুনতে পেলেন হাল্কা পায়ের শব্দ। একটা ছোট্ট দল সেই ঝোপের মধ্য দিয়ে আসছে। ঈশ্বরের দয়া, ওরা নিজেদের লোক! তাঁকে দেখতে পেয়ে ওরা কয়েক মুহুর্ত অপেক্ষা করল। "এ সেই মুচিটা", ওদের বলতে শুনলেন। তারপর তারা চলে গেল।

কিন্তু তাদের বাঁদিক থেকেও এবার হল্লা শোনা গেল। আর সেখানে বিদেশী ভাষায় আদেশ দিতে শোনা গেল। পার্শীয়রা!

সক্রেটিস চেষ্টা করলেন উঠে দাঁড়াতে, অর্থাৎ ডান পায়ের ওপর। তলোয়ারের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন, ওটা আবার একটু বেশী খাটো। তারপর বাঁদিকের ঝোপের ফাঁকে দেখলেন এক দঙ্গল সৈনিক যুদ্ধ করছে। শুনতে পেলেন গোঙানির শব্দ আর ভোঁতা লোহা দিয়ে লোহা কিম্বা চামড়ার ওপর আঘাতের শব্দ।

দিশেহারা হয়ে তিনি ডান পায়ের ওপর লাফাতে লাফাতে পিছু হটতে শুরু করলেন। পা মচ্‌কে আবার আহত পায়ের ওপর দাঁড়াতে গিয়েই আর্তনাদ করে বসে পড়লেন। সেই যুদ্ধরত দঙ্গল যখন আর মাত্র কয়েক পা দূরে এসে পড়েছে, দলটা তেমন বড় নয়, কুড়ি তিরিশ জন হবে, তখন সেই দার্শনিক দুটো কাঁটা ঝোপের মাঝখানে বসে, অসহায় ভাবে শত্রুদের দিকে তাকিয়ে।

তাঁর পক্ষে নড়াচড়া করা অসম্ভব। পায়ের গোড়ালির ঐ ব্যথা আর একবারও অনুভব করার চেয়ে আর সবকিছুই ভাল। কি করবেন বুঝতে পারছেন না, তারপর হঠাৎ শুরু করলেন হুঙ্কার দিতে।

সঠিক ভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, তিনি শুনতে পেলেন, তিনি হুঙ্কার দিচ্ছেন। শুনতে পেলেন, তাঁর ঐ বিশাল বুকের ভেতর থেকে হুঙ্কার বের হচ্ছে, যেন একটা দুন্দুভির মধ্য থেকে: "এই যে, এদিকে! থার্ড ব্যাটেলিয়ন! ওদের মজা টের পাইয়ে দাও। এস হে!"

আর ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি লক্ষ্য করলেন, তিনি তলোয়ারটা তুলে নিয়ে ঘোরাচ্ছেন, কারণ তাঁর সামনে বর্শা হাতে এক পার্শী সৈনিক এসে হাজির হয়েছে। বর্শাটা একপাশে ছিটকে সরে গেল, সেই সঙ্গে মানুষটা।

সক্রেটিস দ্বিতীয় বার নিজেকে হুঙ্কার দিতে শুনলেন, বলছেন:

"এক পা-ও পেছাবে না আর, ভাইসব; এবার পেয়েছি ওদের, যেমনটা চেয়েছিলাম, কুত্তার বাচ্চা সব! ক্রাপোলুস, ছয় নম্বর নিয়ে এগিয়ে যাও! দুজোস, ডানদিকে! যে পিছু হটবে, তাকে আমি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করব!"

তাঁর পাশে নিজেদের দুজনকে দেখে অবাক হলেন, তারা হতাশভাবে তাকিয়ে আছে বোকার মত। তিনি নীচু গলায় বললেন, "চিৎকার কর,

দোহাই তোমাদের, চিৎকার কর।" একজন আতঙ্কে হাঁ করে রইল, কিন্তু অন্য জন সত্যিই হুঙ্কার দিয়ে উঠল, বা খুশী। আর তাদের সামনের পার্শীরা অতি কষ্টে উঠে ঝোপের মধ্যে পালিয়ে গেল।

ঝোপের ফাঁক দিয়ে ডজন খানেক ক্লান্ত লোক টলতে টলতে এল। পার্শীরা সেই হৈ-হল্লা শুনে পালিয়ে গেছে। পেছনে আরো লোক-লস্কর আছে ভেবে ভয় পেয়ে গেছে। "কী হয়েছে এখানে?" সক্রেটিসের একজন দেশওয়ালা জিজ্ঞেস করল; সক্রেটিস তখনো মাটিতে বসে।

"কিচ্ছু না", ইনি বললেন। "ওরকম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে না থেকে বরং এদিক ওদিক ছোটাছুটি কর আর হুকুম চালিয়ে যাও, যাতে ওপক্ষের ওরা টের না পায়, আমরা সংখ্যায় কত কম।"

"বরং আমরা ফিরে যাই", বলল সেই লোকটা অনিচ্ছা ভরে।

"এক পা-ও না", প্রতিবাদ করলেন সক্রেটিস। "তোমরা কি ভীতু পায়রা?"

ভয় পেলে ওসব কথায় সৈনিকদের কোনো কাজ হয় না, কিছুটা ভাগ্যও দরকার। তখন শোনা গেল, বেশ দূর থেকে তবে স্পষ্ট, ঘোড়ার পায়ের শব্দ আর বীভৎস চিৎকার, আর সেই ভাষা গ্রীক্‌। সবাই জানে, সেদিন পার্শীরা কেমন বিপর্যস্ত হয়ে হেরে গেছিল। যুদ্ধ শেষ।

আলকিবিয়াডেস যখন ঘোড়সওয়ারদের নিয়ে সেই কাঁটা ঝোপের মধ্যে এল, তখন দেখতে পেল, পদাতিক সেনারা একজন মোটা লোককে কাঁধে করে চলেছে মিছিল করে।

ঘোড়া থামিয়ে দেখে চিনতে পারল, লোকটা সক্রেটিস, আর সেনারা জানাল, তিনি ভয়লেশহীন ভাবে বাধা দিয়ে আটকে রেখেছিলেন।

তারা তাঁকে উল্লাস ভরে ছাউনি অবধি কাঁধে করে নিয়ে গেল। সেখানে তাঁর প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাঁকে একটা মালগাড়ীতে বসিয়ে, ঘামে ভেজা অবস্থায় তাঁকে ঘিরে উত্তেজিতভাবে চিৎকার করতে করতে সৈন্যরা রাজধানীতে ফিরে এল।

তাঁর স্ত্রী জ্যানথিপে তাঁর জন্য মটরশুঁটির স্যুপ রান্না করতে বসল। হাঁটু গেড়ে উনুনের সামনে বসে গাল ফুলিয়ে ফুঁ দিতে দিতে দিতে তাঁর স্ত্রী মাঝে মধ্যে তাঁর দিকে তাকাচ্ছিল। তাঁর বন্ধুরা তাঁকে যে চেয়ারে বসিয়ে রেখে গেছিল, তিনি তখনো সেখানেই বসে।

"কী হয়েছে তোমার?" জিজ্ঞাসা করল তাঁর স্ত্রী অবিশ্বাসের সুরে।

"আমার?" বিড়বিড় করলেন, "কিছু না।"

"তোমার বীরত্বের কথা যেসব শোনা যাচ্ছে, সেসব তাহলে কী?" জানতে চাইল।

"বাড়াবাড়ি সব", তিনি বললেন, "গল্পটা চমৎকার।"

"উনুনে আঁচই দিলাম না, অথচ গন্ধ বের হল? তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি সব আবার গুলিয়ে গেছে, তাই না?" বিরক্ত হয়ে বলল। "কাল রুটি আনতে গেলে তো আবার হাসাহাসি শুনতে হবে।"

"আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি মোটেও গুলিয়ে যায়নি। আমি যুদ্ধ করেছি।"

"তুমি নেশা করেছিলে?"

"না। ওরা যখন ফিরে যাচ্ছিল, তখন আমি ওদের রুখে দাঁড়াতে বলেছিলাম।"

"তুমি তো নিজেই পার না রুখে দাঁড়াতে", উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল তাঁর স্ত্রী, তখন উনুন জ্বলে উঠেছে। "টেবিলের ওপরে নুনের পাত্রটা আছে, দাও তো।"

"ঠিক বুঝতে পারছি না।" বললেন ধীরে-সুস্থে চিন্তিত ভাবে, "ঠিক বুঝতে পারছি না, আদৌ কিছু খাওয়াটা উচিত হবে কিনা। পেটটা একটু গণ্ডগোল করছে।"

"আমি তো বললামই, তুমি নেশা করেছ। উঠে দাঁড়াও দেখি একবার, ঘরের মধ্যে দু'পা হাঁটো, তাহলেই বোঝা যাবে।"

ওর এই অন্যায় ব্যবহারে তিনি বিরক্ত হলেন। কিন্তু তিনি কোনো-ক্রমেই উঠে দাঁড়িয়ে জানতে দিতে চান না যে তাঁর চলবার ক্ষমতা নেই। মহিলাটি অত্যন্ত চালাক, বিশেষ করে তাঁকে অপদস্থ করবার সুযোগ পেলে তো কথাই নেই। আর যুদ্ধে তাঁর রুখে ওঠার আসল কারণ প্রকাশ পেলে বেশ অস্বস্তিতে পড়তে হবে।

ও তখন উনুনের ওপর কড়াইটা নিয়ে ব্যস্ত, তারই ফাঁকে ফাঁকে জানাল তার মনের কথা।

"আমি ঠিকই জানি, তোমার ঐসব বড়লোক বন্ধুরা তোমাকে আবার লবার পেছনে, সৈন্যদের রসুইখানায় হাড়া ধরনের কাজের ভার দিয়েছিল। ওসব ধাপ্পা ছাড়া আর কিছুই না।"

ব্যথিতভাবে তিনি জানালার ফাঁক দিয়ে গলির ভেতরে তাকালেন, যেখানে বহু লোক উজ্জল আলো নিয়ে চলেছে, বিজয় উৎসব পালন করা হচ্ছে।

তাঁর সম্রান্ত বন্ধুরা ও-জাতীয় চেষ্টা করেনি, আর তিনিও তা মেনে নিতেন না, অন্তত অত সহজে নয়।

"যাকি ওরা একটা মুচি সঙ্গে গেছে দেখেই খুশী? ওরা তোমার জন্য কড়ে আঙুলটাও নাড়বে না। ও একটা মুচি, ওরা বলে, ওর মুচি থাকাই উচিত। নইলে আমরা ওর ঐ নোংরা কোকরের মধ্যে কেন যাব, আর ঘন্টার পর ঘন্টা ওর সঙ্গে বকর বকর করব, আর সারা দুনিয়াকে বলতে শুনব —দেখতো, ওটা মুচি কিনা, এইসব বড় বড় লোকেরা ওর কাছে বসে আছে দেখছি আর ওর সঙ্গে ফিলারসোফি নিয়ে কথা বলছে। যত সব হাবিজাবি।"

"কথাটা ফিলজফোবি", তিনি বললেন ঠাণ্ডা মাথায়।

তাঁর স্ত্রী একটা তিক্ত দৃষ্টি ছুঁড়ে মারল।

"আমাকে অত জ্ঞান দিও না সব সময়ে। আমি জানি, আমার অত বিদ্যে-বুদ্ধি নেই। থাকলে যখন তখন তোমার পা ধোবার জল এগিয়ে দেবার লোক পেতে না।"

তিনি শিউরে উঠলেন, আশা করলেন তাঁর স্ত্রী সেটা লক্ষ্য করেনি। আজ কোনোমতেই পা ধোওয়া চলবে না। ঈশ্বরের আশীর্বাদে সে তার বকবকানি চালিয়ে গেল।

"বেশ, তুমি নেশা করনি আর হাল্কা কাজও ওরা তোমাকে দেয়নি। অর্থাৎ তুমি সত্যিকারের একজন যোদ্ধার কাজ করেছ নিশ্চয়। তোমার হাতে রক্ত লেগেছে, তাইতো? কিন্তু আমি যখন একটা মাকড়সা মাড়িয়ে দিই, তখন তুমি হৈ হৈ করে ওঠ। এমন নয় যে আমি বিশ্বাস করি, তুমি সত্যিসত্যিই একটা কাজের কাজ করেছ, তবে *একটা কিছু চালাকি, একটা* কিছু প্যাঁচালো কাজ তুমি নিশ্চয় করেছ, যার জন্য ওরা সব তোমার পিঠ চাপড়াচ্ছে। তবে আমি ঠিকই সেটা বার করব, তুমি নিশ্চিত থাকতে পার।"

স্যুপ তৈরী। গন্ধে লোভ হয়। মহিলাটি তার পোশাকের কোণা দিয়ে কড়াই-এর আংটা ধরে নামিয়ে টেবিলের ওপর রেখে হাতা দিয়ে ঢালতে শুরু করল।

তিনি একবার ভাবলেন, খাবার ইচ্ছাটা ফিরে পাওয়াটা উচিত হবে কিনা। তাহলে যে তাঁকে টেবিলে গিয়ে বসতে হবে সেই চিন্তাই তাঁকে সময়মত বিরত করল।

অতটা সাহস তাঁর ছিল না। তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন, ব্যাপারটার ইতি তখনো হয়নি। শিগগিরই আরো কত অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হবেই হবে। পার্শীদের সাথে একটা যুদ্ধেই সব মীমাংসা হয়ে যায়নি এবং ছাড় পাওয়া যাবে না। এখন, জয়ের এই প্রথম উল্লাসের ঝোঁক, কার জন্য এই জয় একথা কেউই ভাবছে না। সেটাই স্বাভাবিক। সবাই ব্যস্ত তার নিজের বাহাদুরির কথা চতুর্দিকে ছড়াতে। কিন্তু কাল কিম্বা পরশু সবাই হয়তো দেখবে যে বন্ধুটি সব কৃতিত্ব আত্মসাৎ করে বসে আছে, আর তখন লোকে তাঁকে তুলে ধরতে চাইবে। অনেকে তখন অনেক খুঁত বার করতে পারে, যদি তারা এই মুচিটাকে প্রকৃত বীর বলে ঘোষণা করে। আলকিবিয়া-ডেসকে লোকে এমনিতেই তেমন পছন্দ করে না। মহানন্দে লোকে তাকে বলতে পারে—তুমি যুদ্ধে জিতেছ, তবে একটা মুচি সে যুদ্ধ করেছে।

এদিকে কাঁটাটার যন্ত্রণা আগের চেয়ে বেড়েছে। স্যাণ্ডেলটা জলদি খুলে ফেলতে না পারলে রক্ত বিষিয়ে উঠতে পারে।

"অত হাপুস হুপুস করো না", অন্যমনস্কভাবে বললেন।

স্ত্রীর মুখের মধ্যে চামচটা আটকে গেল।

"কী করছি?"

"কিছু না", ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ঝঞ্ঝাট এড়ানোর জন্য বললেন। "আমি কি একটা চিন্তা করছিলাম।"

তাঁর স্ত্রীর রেগেমেগে উঠে পড়ে কড়াইটা দুম করে উনুনের উপর রেখে বাইরে চলে গেল।

সক্রেটিস একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে নিশ্চিন্ত হলেন। তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে উঠে, কুণ্ঠিত ভাবে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে, এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে পেছন দিকে নিজের জায়গায় গেলেন। তাঁর স্ত্রী বাইরে যাবার জন্য শালটা নিতে আবার ভেতরে ঢুকে তাঁকে নিঃসাড়ে তাঁর চামড়া ঢাকা দোলনায় শুয়ে থাকতে দেখে যেন বিশ্বাস করতে পারল না। এক মুহূর্তের জন্য ভাবল, ওঁর নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে। একবার ভাবলও, তাঁকে সেকথা জিজ্ঞাসা

করবে, সে যে তাঁর খুবই অনুরক্ত। কিন্তু অত কি ভেবে গজগজ করতে করতে ঘর ছেড়ে চলে গেল, প্রতিবেশী মহিলাটির সঙ্গে উৎসব দেখতে।

সক্রেটিসের ঘুম ভাল হল না, ছটফট করলেন, ঘুম ভাঙল দুশ্চিন্তা নিয়ে। স্যাণ্ডেল খোলা হয়ে গেছে, কিন্তু কাঁটাটায় হাত দিতে পারেন নি। পা-টা বেশ ফুলে উঠেছে। তাঁর স্ত্রী আজ সকালে আর তেমন ঝগড়াট করছে না।

সন্ধ্যাবেলায় যে সমস্ত শহর জুড়ে তার খ্যাতির কথা শুনেছে। তাহলে সত্যিসত্যিই একটা কিছু ঘটেছে নিশ্চয়, যার ফলে সবাই এত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। তিনি যে আস্ত একটা পার্শী যোদ্ধার দলকে ঠেকিয়ে রেখেছিল, সেটা অবশ্য তার মাথায় কিছুতেই জায়গা পাচ্ছিল না। ও নয়, তার ধারণা। ওর প্রস্তাবে একটা আস্ত সভাকে ধরে রাখা, হ্যাঁ, সেটা ও পারে। কিন্তু একদল যোদ্ধাকে নয়। তাহলে হয়েছেটা কী?

সে এত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল যে ওঁর জন্য ছাগলের দুধ তাঁর জায়গায় নিয়ে গিয়ে হাজির হল।

তিনি উঠবার কোনো কারণ পেলেন না।

"বাইরে যাবে না?" তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল।

"ইচ্ছে নেই", ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন।

স্ত্রীর বিনীত প্রশ্নের এরকম উত্তর কেউ দেয় না, কিন্তু তাঁর স্ত্রী ভাবল, তিনি বোধহয় লোকের সাধনা সাধনি হওয়াটা এড়িয়ে যেতে চান, তাই উত্তরটা গ্রাহ্য করল না।

সকালের দিকেই লোকজন আসতে শুরু করল।

কয়েকজন জোয়ান ছোকরা, বড়লোক বাপ-মায়ের ছেলে সব, এরাই সাধারণত তাঁর আশে পাশে ঘোরাঘুরি করে। এরা সব সময়ে তাঁকে তাদের শিক্ষক বলে মানে, যখন তিনি ওদের কিছু একটা বলতেন, তখন তো কেউ কেউ টুকেও নিত, যেন বিশেষ কোনো কথা।

আর ওরা এসেই বলতে শুরু করল, এথেন্স তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ফিলসফীর পক্ষে নাকি এটা একটা ঐতিহাসিক তারিখ (তাহলে সে তো ঠিকই বলেছিল, কথাটা ফিলসফী ছাড়া অন্য কিছু নয়)। সক্রেটিস নাকি দেখিয়ে দিয়েছেন, মহান বুদ্ধিবানরা বিশাল কর্মীও হতে পারে।

সক্রেটিস তাঁর স্বভাব সিদ্ধ তামাশা ভুলে ওদের কথা শুনলেন। ওরা যখন কথা বলছিল, তখন তাঁর মনে হচ্ছিল, যেন অনেক দূরের শব্দ শুনছেন, লোকে

যেমন বন্দুকের বারুদের শব্দ শোনে, একটা ভয়ঙ্কর অট্টহাসি, একটা আস্ত শহরের অট্টহাসি, হ্যাঁ সারা দেশের, অনেক দূরে, তবে এগিয়ে আসছে, অপ্রতিহত ভাবে এগিয়ে আসছে, সকলের মধ্যে তার ছোঁয়াচ লাগছে, পথচারীদের, বাজারের ব্যবসায়ী আর রাজনীতিবিদদের, ছোট ছোট দোকানের সব কর্মচারীদের।

"তোমরা যা বলছ, সব বাজে কথা", বললেন তিনি হঠাৎ কি স্থির করে। "আমি কিছুই করি নি।

মুচকি হেসে ওরা পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর একজন বলল :

"ঠিক এই কথাই আমরা বলাবলি করছিলাম। আমরা জানতাম তুমি এই রকমই বলবে। হঠাৎ এত হৈচৈ কেন, স্কুলের সামনে জিজ্ঞেস করছিলাম অ্যান্টিপুলোসকে। দশ বছর সক্রেটিস বিশাল চিন্তাধারা প্রকাশ করেছে, অথচ একটা লোকও তার দিকে একবার ফিরেও তাকায়নি। এখন সে একটা যুদ্ধে জিতেছে, অমনি সমস্ত এথেন্স তার কথা বলছে। তোমরা বুঝতে পারছ না, কী লজ্জার কথা এটা? আমরা বলেছি।'

সক্রেটিস একটা শব্দ করলেন।

"কিন্তু আমি তো আদৌ যুদ্ধ জিতিনি। আমি আক্রান্ত হয়েছিলাম, তাই নিজেকে রক্ষা করেছি। এই যুদ্ধের ব্যাপারে আমার কোনো উৎসাহ ছিল না। আমি অস্ত্র-শস্ত্র বিক্রি করি না, কিম্বা আমার এখানে কোথাও আঙুরের ক্ষেতও নেই। কিজন্য আমি যুদ্ধ করব, তাই আমি জানতাম না। শহরতলির শুভবুদ্ধি লোকেদের মধ্যে আমি থাকি, যুদ্ধের ব্যাপারে তাদের কোনো উৎসাহ নেই, ওরা যা করত আমিও ঠিক তাই করেছি, বড়জোর ওদের চেয়ে কয়েক মুহূর্ত আগে করেছি।"

ওদের তখন একেবারে হতভম্ব অবস্থা।

"ওকথা ঠিক নয়", ওরা চিৎকার করে উঠল, "সেকথা আমরাও বলেছিলাম। তিনি আত্মরক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করেন নি। যুদ্ধে জেতার নিজস্ব ধরণ ওটা তাঁর। অনুমতি দাও, আমরা আবার স্কুলে ছুটে যাই। এই প্রসঙ্গে একটা আলোচনা স্থগিত রেখে এসেছি, তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাবার জন্য।"

তারপর ওরা চলে গেল, সরবে গভীর আলোচনা করতে করতে।

কনুই-এ ভর দিয়ে সক্রেটিস শুয়ে রইলেন, আর ধোঁয়ায় কালো হয়ে যাওয়া ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর আশঙ্কাই তাহলে ঠিক।

তাঁর স্ত্রী ঘরের কোণ থেকে তাঁকে লক্ষ্য করছিল। ঘরের মত সে একটা পোশাক রিপু করে চলেছে।

হঠাৎ চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল: "তাহলে আসল ব্যাপারটা কী ?"

তিনি চমকে উঠলেন। অনিশ্চিত ভাবে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

কর্মক্লান্ত একটা মানুষ, বুকটা একটা তক্তার মত, চোখদুটো বিষণ্ণ। তিনি জানেন, ওর ওপর ভরসা করা যায়। যদি কখনো তাঁর ছাত্ররা বলে বলে— সক্রেটিস ? সেই অপদার্থ মুচিটা না, যে ঈশ্বরদের অস্বীকার করে ? তখন ও তাঁর পক্ষ নেবে। ওর দুর্ভাগ্য তাই তাঁর ঘরে এসে পড়েছে, তবে সেজন্য তার নালিশ নেই, একমাত্র তাঁর কাছে ছাড়া। বড়লোক ছাত্রদের বাড়ী থেকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফিরে তাঁর জন্য রাখা এক টুকরো রুটি আর চর্বির অভাব তিনি কোনো রাত্রে টের পাননি।

তিনি মনে মনে ভাবলেন, ওকে সব বলা ঠিক হবে কিনা। কিন্তু তারপরই তাঁর মনে পড়ল, এর পর যখন লোকজন সব আসবে, এইমাত্র যেমন এসেছিল, আর তাঁর বীরত্বের কথা বলবে, তখন ওর সামনে গাদা গাদা অসত্য কথা বলতে হবে আর ধোঁকাবাজি করতে হবে, ও প্রকৃত ঘটনা জানলে আর তিনি তা পারবেন না, কারণ ওকে তিনি ভয় পান।

তাই তিনি ওর মধ্যে গেলেন না, শুধু বললেন, "কাল রাতের ঠাণ্ডা মটরশুঁটির স্যুপের গন্ধে সমস্ত ঘরটা ভরে উঠেছে।"

তাঁর স্ত্রী কেবল তাঁর দিকে আবার অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাল।

খাবার ফেলে দেবার মত অবস্থা তাঁদের অবশ্যই ছিলনা। তিনি শুধু চেষ্টা করলেন, ওকে অন্য চিন্তায় ফেলতে। তাঁর স্ত্রীর বিশ্বাস দৃঢ় হল, একটা কোনো গণ্ডোগোল তিনি করে বসে আছেন। বিছানা ছেড়ে উঠছেন না কেন ? তিনি চিরকালই দেরীতে বিছানা থেকে ওঠেন, তবে সে তো দেরী করে শুতে যান বলে। গতকাল বেশ সকাল সকালই শুয়েছেন। আর আজ সমস্ত শহর উঠে দাঁড়িয়েছে বিজয় উৎসব করতে। গলির সব দোকান পাট বন্ধ। শত্রুদের পেছন পেছন যে ঘোড়সওয়ারের দল গেছিল তাদের কিছু আজ ভোর পাঁচটার সময় ফিরে এসেছে, তাদের ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা গেছে। মানুষের ভিড় তাঁর খুবই পছন্দ। এমন সব দিনে তিনি সকাল থেকে রাত অবধি ঘুরে বেড়ান আর আলোচনা জুড়ে দেন। তাহলে বিছানা ছাড়ছেন না কেন ?

দরজা অন্ধকার হয়ে উঠল, চারজন লোক এসে ঢুকল শাসকদের তরফের। ওরা ঘরের মধ্যিখানে এসে দাঁড়াল, তাদের ওপর ভার পড়েছে সক্রেটিসকে আরেওপাগ-এ নিয়ে যাবার। সেনাপতি আলকিবিয়াডেস নিজে আদেশ দিয়েছেন, যুদ্ধে তাঁর বীরত্ব প্রদর্শন করার জন্য তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার আয়োজন করতে।

গলিতে একটা গুঞ্জন ওঠাতে বোঝা গেল, প্রতিবেশীরা সবাই এসে বাড়ীর সামনে জড়ো হয়েছে।

সক্রেটিস টের পেলেন, তাঁর ঘাম ঝরছে। তিনি জানেন, এবার তাঁকে উঠতে হবে, আর সঙ্গে যাওয়াটায় অসম্মতি জানাতে হলেও অন্তত দাঁড়িয়ে দু-চারটে নম্র কথা বলে ওদের দরজা অবধি এগিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তিনি জানেন, তিনি খুব বেশী হলে দু-পা'র বেশী চলতে পারবেন না। তখন ওরা তাঁর পায়ের দিকে নজর দেবে, আর সব জানতে পারবে। আর সেই প্রচণ্ড অট্টহাসি শুরু হয়ে যাবে, এইখানে এবং এখনই।

তাই উঠে না দাঁড়িয়ে তাঁর শক্ত বিছানায় শুয়ে পড়ে বিরক্ত ভাবে বললেন:

"আমার সম্বর্ধনার দরকার নেই। আরেওপাগ-এ গিয়ে বল, কিছু বন্ধুর সঙ্গে এগারোটার সময় আমার দেখা করবার কথা, তাদের সঙ্গে দর্শন শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করতে বসব, সেটা আমাদের কাছে জরুরী, আর সেইজন্য আমি যেতে পারছি না বলে দুঃখিত। ওসব সভা-টভা আমার পছন্দ নয়, আমি অত্যন্ত ক্লান্ত।"

শেষ কথাটা যোগ করলেন কারণ দর্শন শাস্ত্র টেনে আনার জন্য তাঁর বিরক্ত লাগছিল, আর প্রথম কথা বলার উদ্দেশ্য, অশালীন ব্যবহার করে সহজে রেহাই পাওয়ার আশা।

শাসকদলের লোকেরা তো এ ভাষাও বোঝে। তারা গোড়ালিতে ভর দিয়ে ঘুরে চলে গেল, বাইরে যেসব লোক দাঁড়িয়ে ছিল তাদের পা মাড়িয়ে দিয়ে।

"সরকারী লোকেদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করা তোমাকে ওরা শিখিয়ে ছাড়বে", তাঁর স্ত্রী বিরক্ত ভাবে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

সক্রেটিস ওরা চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, তারপর তাঁর ভারী দেহটা বিছানার ওপর চট করে ঘুরিয়ে বসলেন বিছানার ধারে, সন্তর্পণে

আড়চোখে দরজার দিকে নজর রেখে আর অত্যন্ত সাবধানে আহত পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন। কোনো আশা নেই।

খাবে নেমে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

আধঘণ্টা কেটে গেল। একটা বই নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। পা-টা নাড়াচাড়া না করলে কিছুই টের পাননা প্রায়।

এবার এল তাঁর বন্ধু আন্তিসথেনেস।

তার মোটা ওভারকোটটা খুলল না, বিছানায় পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে বলল, জোর করে একটুক্ষণ কাশল, সক্রেটিস-এর দিকে তাকিয়ে গলার কাছের খসখসে দাড়ি চুলকোতে থাকল।

"তুমি এখনো শুয়ে? আমি ভেবেছিলাম, শুধু অ্যানথিপের সঙ্গে দেখা হবে। আমি বিছানা ছেড়ে উঠেছি বিশেষ করে তোমার খবর নেবার জন্য। খুব ঠাণ্ডা লেগেছিল, তাই কাল আসতে পারিনি।"

"বোস", সক্রেটিস এক কথায় বললেন।

আন্তিসথেনেস ঘরের কোণ থেকে একটা চেয়ার এনে বন্ধুর কাছে রইল।

"আজ সন্ধ্যায় আবার পড়ানো শুরু করব। আর ফেলে রাখার কোনো কারণ নেই।"

"না।"

"আমি অবশ্য ভাবছি, ওরা আসবে কিনা। আজ তো সব বিশাল ভোজ। তবে এখানে আসবার পথে ফেস্টন বলে ছোকরাটার সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাকে যখন বললাম, আজ অ্যালজাব্রা পড়াব, ও দেখলাম খুব খুশী। আমি বললাম, ও ইচ্ছা করলে হেলমেট পরে আসতে পারে। প্রটাগোরাস আর অন্য সকলে যখন জানবে, ওরা যুদ্ধের পরদিন আন্তিসথেনেস-এর কাছে এ্যালজাব্রা শিখেছে, তখন ওরা রাগে ফেটে পড়বে।"

সক্রেটিস তাঁর দোলনায় আলগোছে দোল খাচ্ছিলেন, সেজন্য তিনি হাত দিয়ে একটু হেলানো দেয়ালে ধাক্কা দিচ্ছিলেন। তাঁর ফোলা ফোলা চোখে তিনি বন্ধুকে খুঁটিয়ে দেখছিলেন।

"আর কারো সাথে তোমার দেখা হয়েছে?"

"বহু লোকের সাথে।"

বেগড়ানো মেজাজে ছাদের দিকে তাকালেন সক্রেটিস। আন্তিসথেনেসকে কি সব খুলে বলা যায়? ওর ব্যাপারে তিনি বলতে গেলে নিশ্চিন্ত। তিনি

নিজে তার পড়িয়ে বাইরে নেননি কখনো, কাজেই আরিসথেনেস-এর মধ্যে সে ব্যাপারে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। এই কঠিন সমস্যাটা ওর কাছে খুলে বলাই বোধহয় ঠিক হবে।

আরিসথেনেস তার ছোট ছোট জ্বলজ্বলে চোখে কৌতূহল ভরে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল:

"পলিয়াসটা সবাইকে ডেকে বলে বেড়াচ্ছে, তুমি নিশ্চয় পালিয়ে গেছিলে, আর ঠিক বুঝতে না পেরে ভুল পথে অর্থাৎ সামনের দিকে গিয়ে পড়েছিলে। কিন্তু তাল ছেলে সেজন্য তাকে পেটাবে ঠিক করে ফেলেছে।"

সক্রেটিস অস্বস্তিকর বিস্ময়ের সাথে তার দিকে তাকালেন।

"বাজে কথা", বললেন অসন্তুষ্ট ভাবে। হঠাৎ তিনি বুঝতে পারলেন, তিনি যদি এইভাবে চালিয়ে যান, তাহলে তাঁর বিরোধী পক্ষ তাঁর কি হাল করে ছাড়বে।

রাত্রে, ভোরের দিকে তিনি ভেবেছিলেন, পুরো ব্যাপারটাকে একটা এক্সপেরিমেন্ট বলে চালান করে বলবেন, তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, সকলের বিশ্বাসের দৌড় কতদূর। "কুড়ি বছর আমি অলিতে-গলিতে শান্তির কথা বলেছি, আর একটা গুজব মাত্র শুনেই আমার নিজের ছাত্ররা আমাকে ভয়ঙ্কর এক যোদ্ধা ভাবছে", ইত্যাদি, প্রভৃতি। কিন্তু সেক্ষেত্রে এই যুদ্ধে জয়ী হওয়া চলত না। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, শান্তিবাদের পক্ষে সময়টা এখন খারাপ। যুদ্ধে হেরে গেলে ওপরওয়ালারাও কিছুকালের জন্য শান্তিবাদী হয়ে ওঠে; যুদ্ধে জিত হলে নীচু শ্রেণীর লোকেরাও যুদ্ধবাদী হয়ে ওঠে, অন্তত কিছু কালের জন্য, যতদিন না তাদের খেয়াল হয়, তাদের কাছে জয় আর পরাজয়ের মধ্যে তফাৎটা তেমন বড় নয়। না, শান্তির কথা বলে সুবিধা হবে না।

গলির ভেতর থেকে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ এল। ঘোড়সওয়াররা বাড়ীর সামনে দাঁড়াল, আর ভেতরে ঢুকল টলমল পায়ে আলকিবিয়াডেস।

"নমস্কার আরিসথেনেস, চর্মের কারবার কেমন চলছে? ওরা সবাই আত্মহারা", উৎফুল্ল ভাবে বলল গলা চড়িয়ে। "আরেওপাগ-এ ওরা তোমার উত্তর শুনে খেপে উঠেছে সক্রেটিস। মজা করবার জন্য তোমাকে বিজয়-মুকুট পরানোর নির্দেশ তুলে নিয়ে তার বদলে তোমাকে পঞ্চাশ ঘা বেত মারবার নির্দেশ দিয়েছি। তাতে অবশ্য ওরা সবাই ক্ষুব্ধ, কারণ ওটা তারা চায় না। কিন্তু, তোমাকে তো সভায় যেতেই হবে। আমরা দুজনে মিলে যাব, পায়ে হেঁটে।"

সক্রেটিস দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। এই যুবক আলকিবিয়াডেস-এর সঙ্গে তাঁর বনে ভাল। দুজনে বসে অনেকবার একসঙ্গে মদ খেয়েছেন। তাঁর কাছে যে এসেছে, এটা আনন্দের কথা। এটা ঠিক যে আরেওপাগ-এর ইচ্ছার ফলেই সে এখানে আসেনি। আর এই যে ইচ্ছাটা প্রকাশ করল, এটাও সম্মানজনক এবং এক্ষেত্রে সহযোগিতা করা উচিত।

অবশেষে দোলনায় দোল খেতে খেতে সাবধানে বললেন, "তাড়াহুড়া থাকে যণ্ডের, বাড়ী-ঘর উল্টে ফেলে। বস।"

আলকিবিয়াডেস হেসে একটা চেয়ার টেনে আনল। বসবার আগে দেখল, জ্যানথিপ্পে রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে পোশাকে হাত মুছছে, তার দিকে একবার নম্রভাবে ঝুঁকে বসল।

"তোমরা, দার্শনিকরা অদ্ভুত লোক", বলল একটুখানি অধৈর্যের সঙ্গে। "এখন হয়তো তোমার আবার দুঃখ হচ্ছে, আমাদের এই যুদ্ধে জেতবার জন্য সাহায্য করেছ বলে। মনে হচ্ছে আন্তিসথেনেস তোমাকে দেখিয়ে দিয়েছে, খুব একটা যথেষ্ট কারণ এর পক্ষে নেই।"

"আমরা এ্যানক্সাগোরাস নিয়ে কথা বলছিলাম", তাড়াতাড়ি বলে উঠল আন্তিসথেনেস আর আবার কেশে উঠল।

আলকিবিয়াডেস এক গাল হাসল।

"অন্য কিছু আমি আশা করিনি। এসব ব্যাপারে বেশী বাড়াবাড়ি করাটা শুধু ঠিক নয়। তাই না? এখন, আমার মতে এটা হচ্ছে প্রকৃত বীরত্ব। বলতে পার তেমন কিছু না, কিন্তু একমুঠো জলপাই পাতাই বা এমন কি বিশেষ বস্তু হতে পারে? দাঁত চেপে সহ্য কর, ব্যাপারটা চুকে যাক, বুঝলে বুড়ো। ঝটপট শেষ হয়ে যাবে, আর ব্যথাও পাবে না। তারপর আমরা যাব, এক পাত্তর টানতে।"

কৌতূহল ভরে তাকাল চওড়া, শক্ত সমর্থ চেহারাটার দিকে, ওটা এখন বেশ জোরে দোল খাচ্ছে।

সক্রেটিস চট্ করে ভেবে নিলেন। তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে কি বলা যায়। তিনি বলতে পারেন, গতকাল রাত্রে কিম্বা আজ সকালে তাঁর পা মচকে গেছে। বলা যায়, সৈন্যরা যখন তাঁকে তাদের কাঁধ থেকে নামিয়ে দেয় তখন। সেখানে একটা কথাও উঠবে। এই ঘটনায় ফলে জানা যাবে,

একজন নিজেদের লোককে সম্মান দেখাতে গিয়ে কত সময়ে লোকে তার ক্ষতি করে বসে।

ঢোল খাওয়া না থামিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকলেন, ফলে খাড়া হয়ে বসতে পারলেন। ডান হাত দিয়ে খালি হাতটা ওপর থেকে নীচে ঘষতে ঘষতে বললেন ধীরে সুস্থে :

"ব্যাপারটা হচ্ছে, আমার পা…"

এই কথা বলবার সময় তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল রান্না ঘরের দরজার জ্যানথিপ্পের ওপর। তাঁর দৃষ্টি স্থির ছিল না, কারণ এইবার প্রথম এই প্রসঙ্গে সত্যিকারের মিথ্যে কথা বলা হবে, এতক্ষণ তিনি শুধু চুপ করে ছিলেন।

সক্রেটিস ভাষা হারিয়ে ফেললেন। একটা গল্প কাঁদবার সব ইচ্ছা তাঁর হঠাৎ উবে গেল। তাঁর পা মচকায়নি।

ঢোলনা থেমে গেল।

"শোন আলকিবিয়াডেস", বললেন উৎসাহ ভরে এবং বেশ তাজা গলায়, "এক্ষেত্রে বীরত্বের কথা ওঠে না। যুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্র, অর্থাৎ প্রথম পার্শীকে দেখতে পেয়েই আমি তৎক্ষণাৎ পালিয়ে গেছি, এবং ঠিক দিকেই পালিয়েছি—পেছন দিকে। কিন্তু সেখানে একটা কাঁটা ঝোপ ছিল। আমার পায়ে একটা কাঁটা বিঁধে যায়, ফলে আর নড়তে পারি নি। তখন আমি পাগলের মত আমার চারপাশে তলোয়ার চালিয়েছি আর নিজেদেরই কিছু লোককে প্রায় সাবাড় করে ফেলেছিলাম। দিশেহারা হয়ে আমি অন্য সব ব্যাটেলিয়ন-এর নাম নিয়ে হাঁক-ডাক করছিলাম, যাতে পার্শীদের বিশ্বাস হয়, ওগুলো রয়েছে। ওটা অবশ্যই অবান্তর ছিল, ওরা তো গ্রীক ভাষা জানে না। ওদিকে ওরা বেশ ভয় পেয়েছে বলে মনে হয়েছিল। ওরা বোধ হয় ঐ চিৎকার সহ্য করতে পারে নি, বিশেষ করে অতটা পথ এগিয়ে আসতে যত ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়েছে তারপর। ওরা এক মুহূর্তের জন্ত দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আর তখনই আমাদের ঘোড়সওয়াররা এসে হাজির হয়। এই হল আসল কথা।"

কয়েক সেকেণ্ড ঘরের ভেতরটা নিস্তব্ধ হয়ে রইল। আলকিবিয়াডেস অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। আন্তিসথেনেস মুখের সামনে হাত দিয়ে কাশল, এবার একদম স্বাভাবিক ভাবে। যেখানে জ্যানথিপ্পে দাঁড়িয়ে ছিল, সেই রান্নাঘরের দরজার ওখান থেকে একটা প্রচণ্ড অট্টহাসি ভেসে এল। তারপর আন্তিসথেনেস বলল নিরানন্দ ভাবে :

"আর তাই তুমি স্বাভাবিক কারণেই বিনা-যুদ্ধে নিজে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে অ্যারেওপাগ-এ যেতে পারনি। এবার বুঝলাম।"

আলকিবিয়াডেস চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে চোখ কুঁচকে বোকার মতো দার্শনিককে খুঁটিয়ে দেখল। সক্রেটিস তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন না, আন্তিসথেনেসও না।

আলকিবিয়াডেস আবার সামনে ঝুঁকে হাত দিয়ে সক্রেটিস-এর একটা হাঁটু জড়িয়ে ধরল। তার ললাটে কচি মুখ একটু কুঁচকে উঠল, কিন্তু তার চিন্তা বা মনের অবস্থা প্রকাশ পেল না।

"তুমি কেন বললে না, যে তুমি অন্য কোনো একটা আঘাত পেয়েছ?" জিজ্ঞাসা করল।

"কারণ কাঁটাটা আমার পায়ে বিঁধে আছে", সক্রেটিস বললেন কর্কশ স্বরে।

"ও, তাই?" বলল আলকিবিয়াডেস। "বুঝলাম।" তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বিছানার কাছে গেল।

"আমার নিজের মুকুটটা সঙ্গে করে আনিনি বলে আফসোস হচ্ছে। ওটা আমার লোকটার হাতে দিয়ে এসেছি রেখে দেবার জন্য। নইলে ওটা আমি এখন তোমাকে দিয়ে যেতাম। তুমি বিশ্বাস করতে পার, আমি তোমাকে যথেষ্ট সাহসী মনে করি। এমন কেউ আছে বলে জানিনা, যে তুমি যা বললে তা বলতো বর্তমান অবস্থায়।"

এবার সে তাড়াতাড়ি বাইরে চলে গেল।

তারপর যখন জ্যানথেপে পা-টা ধোবার সময় কাঁটাটা বার করল, তখন বলল বিরক্তভাবে :

"রক্ত বিষিয়ে উঠতে পারত।"

"অন্তত পক্ষে", বললেন দার্শনিক।

অবিমৃষ্যকারী বৃদ্ধা

আমার ঠাকুর্দা যখন মারা গেলেন তখন আমার ঠাকুরমার বয়স বাহাত্তর বছর। থাকেন এলাকার ছোট্ট একটা শহরে ঠাকুর্দার একটা ছোট সিমোপ্রাকটীর কারখানা ছিল, সেখানে তিনি দু-তিনজন সহকারী নিয়ে মৃত্যু অবধি কাজ করেছেন। আমার ঠাকুরমা ঝি ছাড়াই বাড়ীর কাজকর্ম চালিয়ে নিতেন, পুরোনো ধরধরে বাড়ীটা দেখাশুনা করতেন, আর লোকজন আর বাচ্চাদের জন্য রান্না করতেন।

ঠাকুরমা ছিলেন ছোট-খাট রোগাটে মহিলা, চোখদুটো ছিল পিরপিটির মত চঞ্চল, কিন্তু কথা বলবার ধরন ছিল ধীরে ধীরে। যে সাতটি সন্তানের জন্ম তিনি দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে পাঁচজনকে বড় করে তুলেছিলেন বেশ অভাব অনটনের মধ্যে। তার ফলেই বয়সের সাথে সাথে আরো ছোট হয়ে পড়েছিলেন।

সন্তানদের মধ্যে দুজন মেয়ে আমেরিকা চলে গেছিল, আর দুজন ছেলেও অন্যত্র চলে গেছিল। কেবল সবচেয়ে ছোট ছেলে, যার স্বাস্থ্য তেমন ভাল ছিল না, সে সেই শহরে রয়ে যায়। এই ছেলে বই ছাপার কাজ করত, আর তার পরিবারটিও ছিল রীতিমত বড়।

কাজেই আমার ঠাকুরদা মারা গেলে ঠাকুরমা বাড়ীতে একা পড়ে গেলেন।

তাঁর কি হবে এই সমস্যা নিয়ে সন্তানরা চিঠি দিয়েছিল। একজন তার কাছে একটা থাকবার বন্দোবস্ত করতে চেয়েছিল, বই ছাপার কাজ যে করত সে তার পরিবার নিয়ে তাঁর কাছে এসে উঠতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই বৃদ্ধা সব প্রস্তাব নাকচ করে কেবল যেসব সন্তানের ক্ষমতা ছিল তাদের কাছ থেকে মাসিক আর্থিক সাহায্য নিতে রাজী বলে জানিয়েছিলেন। সিমোপ্রাকটীর কারখানাটা বেশ পুরোনো হয়ে গেছিল, ওটা বিক্রি করে বলতে গেলে কিছুই পাওয়া যায়নি, তাছাড়া দেনাও ছিল।

সন্তানরা তাঁকে লিখল, তিনি তো আর বসে একেবারে একা থাকতে

পারেন না, কিন্তু তিনি যখন সেসব কথায় আদৌ কর্ণপাত করলেন না তখন তারা হাল ছেড়ে দিয়ে মাসে মাসে সামান্য কিছু অর্থ পাঠাতে শুরু করল। তারা ভাবল, আর যাই হোক, বই ছাপে যে ভাই সে তো সেই শহরেই আছে।

ছোট ভাইটিও তার ভাইবোনদের কাছে তাদের মায়ের খবরাখবর দেবার ভার নিয়েছিল। আমার বাবার কাছে লেখা তার চিঠিগুলি আমি ঠাকুরমাকে কবর দেবার দু-বছর পরে একবার বেড়াতে এসে পাই। সেই দুই বছরে কি ঘটেছিল তার একটা আভাস আমি এই চিঠিগুলোতে পাই।

মনে হল, ঠাকুরমা তার ছোট ছেলেকে বেশ বড়সড় ফাঁকা বাড়িতে উঠে আসতে দিতে আপত্তি জানাবার ফলে সে প্রথম থেকেই হতাশ হয়েছিল। সে চারটি সন্তান নিয়ে তিনটে ঘরে থাকত। কিন্তু সেই বৃদ্ধা কেবলমাত্র খুব আলগা একটা সম্পর্ক রেখেছিলেন তার সঙ্গে। তিনি বাচ্চাদের প্রত্যেক রবিবার বিকেলে কফি খাবার নিমন্ত্রণ করতেন, ব্যাস ঐ পর্যন্ত।

তিন বছরে চার থেকে আটবার তাঁর ছেলের সঙ্গে দেখা করেছেন আর ছেলের বৌকে বছরের জন্য বেরী বানিয়ে রাখতে সাহায্য করতেন। তাদের ঐ ছোট বাড়ীতে জায়গার খুব অভাব, বৃদ্ধার এজাতীয় বক্তব্য সম্বন্ধে বৌটি উল্লেখ করত। ছেলে তার খবরে সেকথা লিখতে গিয়ে আশ্চর্য প্রকাশ করতে দ্বিধা করত না।

আমার বাবা একবার চিঠিতে জানতে চেয়েছিল, বৃদ্ধা তাহলে তখন কী করতেন; তার উত্তরে সামান্য কথায় লিখেছিল, তিনি নাকি সিনেমা দেখতে যান।

একথাটা মানতেই হবে, এটা ঠিক স্বাভাবিক নয়, বিশেষ করে তাঁর সন্তানদের চোখে। ত্রিশ বছর আগের সিনেমা আজকের মত ছিল না। সেগুলো ছিল নোংরা, ছোট ঘর, প্রায়ই একটা স্কিটল খেলার জায়গায়, ঢোকবার মুখে বিশাল বিশাল পোস্টার, তাতে খুন আর আবেগ ঘোষণা করা হতো লোকজনকে। প্রকৃতপক্ষে অপরিণত বয়সের লোকেরা যেত আর যেত প্রেমিক-প্রেমিকরা, ভেতরটা অন্ধকার বলে। একা একজন বৃদ্ধা সেখানে বেমানান।

আমার এই সিনেমায় যাবার অন্য দিকটাও ভেবে দেখবার মত। টিকিটের দাম অবশ্যই কম ছিল, কিন্তু যেহেতু সেই প্রমোদ জলখাবার বেশ নিচে ছিল, সেই হেতু ওটা "মনে কেনা সস্তা" বলে গণ্য হতো। আর অর্থ জলাঞ্জলি দেওয়া তেমন ভাল কাজ নয়।

আমার ঠাকুরমা যে সেই শহরে তাঁর ছেলের সঙ্গে শুধু নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ করতেন না তা নয়, অন্য কোনো পরিচিতজনের কাছেও যেতেন না বা তাদের নিমন্ত্রণ করতেন না। সেই শহরে সবাই যেখানে একসঙ্গে বসে কফি খায়, সেখানে তিনি কখনো যেতেন না। তার বদলে তিনি প্রায়ই এক মুচির কারখানায় যেতেন, এক বস্তি এলাকায়, আর সেই গলিটার একটা বদনামও ছিল। সেখানে, বিশেষ করে বিকেলের দিকে যেসব লোকেরা আড্ডা দিত তারা তেমন সম্ভ্রান্ত কেউ ছিল না। তাঁতিখানার বেকার মেয়েমানুষ আর দিনমজুর সব। মুচিটা ছিল মধ্যবয়সী, সে সারা দুনিয়া ঘুরে এসেছে তবে তার ফলে কিছু কাজের কাজ হয়নি। লোকে বলে, সে মদ্যপও ছিল। আমার ঠাকুরমার পক্ষে লোকটা আর যাই হোক কোনো সম্পর্ক রাখবার মত কেউ ছিল না।

একটা চিঠিতে ছোট ছেলে আভাস দিয়েছিল যে সে তার মায়ের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলে রীতিমত নিরালম্ব উত্তর পেয়েছে। "লোকটা অনেক দেখেছে", এই ছিল তাঁর উত্তর, আর সেই আলোচনার সেখানেই ইতি। ঠাকুরমা যে ব্যাপারে কথা বলতে চাইতেন না, সে ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা সহজ ছিল না।

ঠাকুরদা মারা যাবার প্রায় মাস ছয়েক পর ছোট ছেলে আমার বাবাকে লেখে, ঠাকুরমা নাকি একদিন অন্তর হোটেলে খান।

এ আবার কোন দেশী খবর !

ঠাকুরমা, যিনি সারা জীবন এক গুজন লোকের জন্য রান্না করেছেন আর সবসময়ে কেবল উদ্বৃত্ত খাদ্য খেয়ে এসেছেন, তিনি এখন হোটেলে খান ! তাঁর হয়েছে কী ?

তার কিছুদিন পরেই আমার বাবা অফিসের কাজে ঐ শহরের কাছাকাছি একটা জায়গায় গেছিল, তখন মায়ের সঙ্গে দেখা করে।

ঠাকুরমা তখন বাইরে যাবার উদ্যোগ করছিলেন। তিনি টুপিটা আবার খুলে রাখেন আর বাবাকে বিস্কুট আর রেড ওয়াইন খেতে দেন। তাঁর মেজাজ মোটামুটি ভালই মনে হয়েছিল, খুব উচ্ছ্বসিত নয় আবার তেমন গম্ভীরও নয়। আমাদের সকলের খবর নিলেন, তবে তেমন খুঁটিয়ে নয়, বিশেষ করে জানতে চাইলেন, বাচ্চাদের জন্ত চেরি ফল পাওয়া যায় কিনা। ওটা ওঁর বরাবরের স্বভাব। ঘরটা অবশ্য সাংঘাতিক পরিষ্কার, আর তাঁকে দেখে সুখীই মনে হয়েছিল।

তাঁর এই নতুন জীবনের একটা ব্যাপার বোঝা গেছিল। তিনি আমার বাবার সঙ্গে গোরস্থানে তাঁর স্বামীর সমাধি দেখতে যেতে চাননি। "তুই একাই যেতে পারবি", বলেছিলেন কথা প্রসঙ্গে, "প্রথম সারিতে বাঁদিকের তৃতীয় কবরটা। আমাকে একটা জায়গায় যেতে হবে।"

ছোট ছেলে পরে ব্যাখ্যা করে বলেছিল, খুব সম্ভব সেই মুচির ওখানে গেছিলেন। সে অনেক অভিযোগ করেছিল।

"আমি তল্পিতল্পা এই গর্তের মধ্যে পড়ে আছি, কাজ করি পাঁচ ঘণ্টা, তাও জঘন্য মজুরীতে, সেইসঙ্গে আমার হাঁপানিও ঝামেলা করছে, ওদিকে বড় রাস্তার ওপর বাড়ীটা ফাঁকা পড়ে আছে।"

আমার বাবা হোটেলে একটা ঘর নিয়ে ছিল, তবে আশা করেছিল, তার মা তাকে তাঁর কাছে থাকতে বলবেন, অন্তত মুখের কথা, কিন্তু তিনি সে ব্যাপারে কোনো কথাই বলেন নি। কিন্তু যখন ঐ বাড়ী বোঝাই লোক থাকত, তখন কিন্তু তাঁদের সঙ্গে না থেকে হোটেলের পেছনে খরচা করার ব্যাপারে তাঁর বরাবর আপত্তি ছিল!

কিন্তু মনে হল তিনি সাংসারিক জীবনকে ছুটি দিয়েছেন, এখন যখন তাঁর জীবন শেষ হয়ে এসেছে তখন নতুন পথে যেতে চান। আমার বাবার যথেষ্ট পরিমাণ উদারতা ছিল, এবং তাঁকে "সম্পূর্ণ সচেতন" বলেই মেনে নিয়েছিলেন, আর আমার কাকাকে বলেছিলেন, বুড়াটিকে তাঁর ইচ্ছা মত চলতে দিতে।

কিন্তু তিনি কী চাইতেন?

তারপর যে খবর পাওয়া গেছিল, তা হচ্ছে, তিনি একটা গাড়ী ভাড়া করেছিলেন, এক বৃহস্পতিবার এক জায়গায় বেড়াতে যাবার জন্য। ও রকম একটা গাড়ীতে আস্ত একটা পরিবারের জায়গা হয়, সেটার চাকাগুলো বিশাল বিশাল এবং ঘোড়ায় টানে ওসব গাড়ী। যখন আমরা সব নাতি-নাতনীরা বেড়াতে আসতাম, তখন ঠাকুরমা কদাচিৎ ওরকম গাড়ী ভাড়া করতেন। ঠাকুরমা সবসময়ে বাড়ীতে থেকে যেতেন। যেতে দু'ও গোছের হাত নেড়ে সঙ্গে যাওয়া এড়িয়ে গেছেন।

তারপর, ঐ গাড়ী করে বেড়াতে যাবার পর, গেছিলেন একটা শহরে, এক বড় গোছের শহরে, রেলে যেতে দু'ঘণ্টা লাগে। সেখানে ঘোড়দৌড় ছিল, এবং আমার ঠাকুরমা সেই ঘোড়দৌড়ে গেছিলেন।

ছোট ছেলে এবার রীতিমতভাবে শঙ্কিত হয়ে উঠল। সে একজন ডাক্তার

নিয়ে যেতে চেয়েছিল। সেই চিঠি পড়ে আমার বাবা মাথা নেড়েছিল, তবে ডাক্তার নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আপত্তি করেছিল।

সেই শহরে ঠাকুরমা একা যান নি। সঙ্গে নিয়ে গেছিলেন একটি মেয়েকে, ছোট ছেলে লিখেছিল, একটি প্রায় হাবাগোবা মেয়ে, ঠাকুরমা যে হোটেলে খেতেন একদিন অন্তর, সেই হোটেলের রাঁধুনী ছিল সে।

এরপর থেকে এই "হাবাগোবা" একটা ভূমিকা নিয়েছিল।

ওর ব্যাপারে আমার ঠাকুরমার একটা বড় দুর্বলতার সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি ওকে নিয়ে সিনেমায় যেতেন, মুচিটার ওখানে নিয়ে যেতেন। জানা গেছিল, লোকটা সোস্তাল ডেমোক্র্যাট, তা ছাড়া গুজব শোনা গেছিল, ঐ দুই মহিলা রান্নাঘরে একটা রেড ওয়াইন নিয়ে বসে তাস খেলত।

"মা ঐ হাবাগোবাটাকে একটা টুপি কিনে দিয়েছে, তার ওপর গোলাপ বসানো", ছোট ছেলে লিখেছিল দিশেহারা হয়ে। "এদিকে আমাদের আমার কম্যুনিয়নে যাবার পোশাক নেই!"

আমার কাকার চিঠিগুলো প্রলাপের মত হয়ে উঠেছিল, সেসব চিঠিতে থাকত কেবল "আমাদের প্রিয় মায়ের অন্যায় কাজের" খবর, তাছাড়া আর কিছুই থাকত না। বাকিটা আমার বাবার কাছে শোনা।

হোটেলের মালিক বাবাকে চোখ টিপে বিড়বিড় করে বলেছিল, 'ফ্রাউ বে. এখন যা হোক একটু ফূর্তি করে নিচ্ছেন, সেরকমই শোনা যাচ্ছে।"

প্রকৃত পক্ষে আমার ঠাকুরমা এই শেষ বছর কটাও কিন্তু কোনোক্রমেই বিলাসিতার মধ্যে কাটাননি। হোটেলে না খেলে তিনি বেশীর ভাগ দিনই সামান্য একটু ডিম দিয়ে তৈরী খাদ্য শুধু খেতেন, একটু কফি, আর সব কিছু বাদ দিলেও তাঁর প্রিয় বিস্কুট। সেই সঙ্গে তিনি সস্তা দামের রেড ওয়াইন কিনতেন, আর প্রত্যেকবার খাওয়ার পর তার থেকে ছোট্ট এক গ্লাস খেতেন। বাড়িটা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখেছিলেন, শুধু শোবার ঘর আর রান্নাঘরটা না, ও দুটোই তিনি ব্যবহার করতেন। যা হোক, তাঁর সন্তানদের না জানিয়ে তিনি বাড়ি বন্ধক দিয়েছিলেন। কখনো জানা যায় নি, সেই অর্থ দিয়ে তিনি কি করেছিলেন। মনে হয় তিনি তা সেই মুচিকে দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সে অন্য একটা শহরে চলে যায়, আর সেখানে মাপি সে অর্ডারী জুতো বানাবার একটা বেশ বড় কারবার খুলেছিল।

ভাল করে ভেবে দেখলে বোঝা যাবে তিনি পরপর দুটো জীবন যাপন

করেছেন। প্রথমটা, মেয়ে, স্ত্রী আর মায়ের জীবন, আর দ্বিতীয়টা যেন ফ্রাউ বে. হিসেবে। ফ্রাউ বে., একজন একা লোক, কোনো দায়িত্ব নেই, আছে সামান্য হলেও যথেষ্ট আর্থিক সামর্থ্য। প্রথম জীবনটায় প্রায় ছয় দশক সময় কেটেছে, দ্বিতীয়টায় দুবছরের বেশী নয়।

আমার বাবা জানতে পেরেছিল, তিনি শেষ ছয়মাস বিশেষভাবে স্বাধীনতাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, যা সাধারণ লোকে ভাবতেও পারে না। যেমন গ্রীষ্মকালে রাত তিনটের সময় ঘুম থেকে উঠে ফাঁকা রাস্তায় বেড়াতে যেতেন, ঐ ছোট্ট শহরে ঐ সময়ে তিনি একাই থাকতেন পথে। আর, বৃদ্ধা মহিলা বলে যে পাত্রী তাঁকে সঙ্গ দিতে তাঁর কাছে আসত, তাকে নাকি তিনি সিনেমায় যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন, লোকের তাই ধারণা।

তিনি কিন্তু কোনোক্রমেই একলা ছিলেন না। মুচিটার ওখানে মনে হয় প্রচুর মজার লোকের যাতায়াত ছিল, আর সেখানে গল্পও হত প্রচুর। সেখানে তাঁর নিজের কেনা এক বোতল রেড ওয়াইন সব সময়ে মজুত থাকত, তার থেকে তিনি ছোট্ট এক গ্লাস খেতেন, ওদিকে অন্যেরা গল্প করত আর শহরের নামী কর্তাব্যক্তিদের নিয়ে মস্করা করত। এই রেড ওয়াইন ওঁর জন্য রিজার্ভ করা থাকত, তবে সাথীদের জন্য মাঝে মধ্যে কড়া জাতের মদ নিয়ে যেতেন।

কাউকে কিছু জানতে না দিয়ে হেমন্তের এক বিকেলে তিনি তাঁর শোবার ঘরে মারা যান, তবে বিছানায় শুয়ে নয়, জানালার ধারে কাঠের চেয়ারে বসে। তিনি সেদিন সন্ধ্যাবেলায় সিনেমায় যাবার জন্য সেই "হাবাগোবাকে" নিমন্ত্রণ করেছিলেন, আর তাই তাঁর মৃত্যুর সময়ে সেই মেয়েটা পাশে ছিল। তাঁর বয়স তখন চুয়াত্তর বছর।

তাঁর মৃত্যু শয্যায় তোলা ফটো তাঁর নাতি-নাতনীদের জন্য তুলে রাখা হয়েছিল, আমি সে ফটো দেখেছি।

একটা ছোট্ট মুখ, তাতে প্রচুর ভাঁজ পড়েছে চামড়ায়, আর ঠোঁট দুটো পাতলা তবে মুখের হাঁ বেশ বড়। বেশ ছোট তবে ছোট অন্তঃকরণের নয়। তিনি দীর্ঘকাল বিয়ের জীবন আর সামান্য কদিন স্বাধীনতা ভোগ করেছেন, আর জীবনের রুটি, টুকরোটুকু বাদ দিয়ে, সবটুকু হজম করেছেন।

হেয়ার কয়নার-এর কাহিনী

হেয়ার কয়নার এবং প্রকৃতি

প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা জিজ্ঞাসা করলে হেয়ার কয়নার বলেছিলেন, "আমি মাঝে মধ্যে বাড়ির বাইরে গিয়ে দু-চারটে গাছ দেখতাম। বিশেষ করে দিনের এবং ঋতুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অন্য রকম দেখায় আর প্রকৃত একটা অবস্থায় পরিণত হয় বলে। কালে কালে শহরগুলোর মধ্যেও আমরা দিশেহারা হয়ে পড়ি, দেখি শুধুই প্রয়োজনীয় বস্তু সব, বাড়ি আর পথ, কেউ থাকে না, ফাঁকা কিম্বা ব্যবহার করে না কেউ, অপ্রয়োজনীয় হতে পারত। আমাদের নিজস্ব সমাজ ব্যবস্থা তো মানুষকেও এক জাতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু বলে গণ্য করে, আর সেইজন্যই গাছেরা অন্তত আমার কাছে প্রশান্ত, স্বয়ংসম্পূর্ণ, আমার তরফ থেকে উপেক্ষিত, কারণ আমি কাঠ-মিস্ত্রী নই, এমনকি আমি আশা করি, কাঠ-মিস্ত্রীদের ব্যাপারেও ওগুলোর মধ্যে কিছু আছে যার মূল্যায়ণ সম্ভব নয়।"
(হেয়ার ক. আরো বলেছিলেন, "আমাদের দরকার প্রকৃতিকে যথাসম্ভব কম ব্যবহার করা। বিনা কাজে প্রকৃতির মধ্যে সময় কাটালে সহজেই অসুস্থ অবস্থায় পড়তে হয়, জ্বর জাতের কিছু হতে পারে লোকের)।

সুব্যবস্থা

হেয়ার ক. একবার বলেছিলেন, "চিন্তাশীল ব্যক্তি চিন্তা করিয়া আলো ব্যবহার করে, চিন্তা করিয়া খাদ্য গ্রহণ করে এবং চিন্তা করিয়া চিন্তা করে।"

আকার এবং উপাদান

হেয়ার ক. একটি ছবি দেখছিলেন, ছবিটাতে বেশ কিছু ইচ্ছামত আকৃতি ব্যবহার করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, "কিছু শিল্পী আছে, দুনিয়াটা দেখবার সময় তাদের অবস্থা বহু দার্শনিকের মত হয়। আকার নিয়ে এমন

ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে উপাদানটাই হারিয়ে যায়। আমি একবার এক মালীর ওখানে কাজ করেছিলাম। সে আমার হাতে গাছ-কাটা একটা কাঁচি দিয়ে লরল গাছ ছাঁটতে বলেছিল। গাছটা ছিল "একটা টবে আর কোন এক উৎসবের জন্ত দেবার কথা ছিল। সেজন্য গাছটার আকৃতি বলের মত গোল হওয়া দরকার ছিল। আমি সাথে সাথে লেগে গেলাম সেই ছন্নছাড়া গাছটা ছাঁটতে, কিন্তু বহুক্ষণ ধরে শত চেষ্টা করেও ওটাকে গোল আকৃতি দিয়ে উঠতে পারিনি। একবার এপাশে, অন্যবার ওপাশে বেশী ছেঁটে ফেলছিলাম। অবশেষে যখন ওটা একটা বলের আকৃতি পেল, বলটা বড্ড ছোট হয়ে গেছে তখন।" মালী হতাশ হয়ে বলেছিল, "বেশ, এটা একটা বল, কিন্তু লরলটা গেল কোথায়?"

বন্ধুকৃত্য

বন্ধুকে সাহায্য করবার প্রকৃত উপায় হিসেবে হেস্নার ক. এই উদাহরণের গল্পটি বলেন। একজন বৃদ্ধ আরব-এর কাছে তিনজন যুবক এসে বলে, "আমাদের বাবা মারা গেছেন। তিনি আমাদের জন্য সতেরোটা উট রেখে গেছেন, আর একটা উইল করে গেছেন। সেই অনুসারে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় জন অর্ধেক, দ্বিতীয় জন এক তৃতীয়াংশ আর সবচেয়ে ছোট জন নয় ভাগের এক ভাগ পাবে। এখন আমরা এই ভাগাভাগি ব্যাপারে একমত হতে পারছি না। তুমি এর ভার নাও!" আরবটি একটু ভেবে বলল, "যা দেখছি, সহজে ভাগ করতে গিয়ে তোমাদের একটা উট কম পড়ছে। আমার নিজের একটিমাত্র উট আছে, তবে সেটা তোমরা নিতে পার। ওটা নিয়ে যাও, আর তারপর ভাগাভাগি করে নাও, তারপর যা উদ্বৃত্ত থাকবে, আমাকে ফেরত দিয়ে যেও।" ওরা এই বন্ধুকৃত্যের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে উটটা নিয়ে গেল। তারপর আঠারোটা উট এমন ভাগ করল যে, সবচেয়ে বড় জন অর্ধেক, অর্থাৎ নয়টা, দ্বিতীয় জন এক তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ ছয়টা, আর সবচেয়ে ছোট জন নয় ভাগের একভাগ, অর্থাৎ দুটো উট পেল। যার যার উট সরিয়ে নেবার পর অবাক হয়ে দেখল, একটা উট উদ্বৃত্ত রয়ে গেছে। সেটাকে ওরা ওদের বৃদ্ধ বন্ধুর কাছে ফেরত নিয়ে এসে আর একবার ধন্যবাদ জানিয়ে গেল। হেস্নার ক. এই বন্ধুকৃত্যকে উপযুক্ত বললেন, কারণ এতে কারো বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় নি।

(অনুবাদ: দেবব্রত চক্রবর্তী)

নির্ভরযোগ্যতা

মানুষের পরস্পরের প্রতি আচরণের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলার পক্ষে ছিলেন হেয়ার ক, ফলে তাঁকে সারা জীবন অনেক ঝঞ্ঝাটের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। একবার তিনি আবার এক অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েছিলেন। সেবার একই রাত্রে শহরের মধ্যে বহু দূরে দূরের জায়গায় যাবার দরকার হয়ে পড়েছিল। তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন বলে তাঁর এক বন্ধুর ওভারকোটটা চেয়েছিলেন। বন্ধুটি সেটা দিতে রাজী হয়েছিল, যদিও সেজন্য তাকে একটা সামান্য কাজ মুলতবী রাখতে হয়। সন্ধ্যের দিকে হেয়ার ক-এর এমন দুরবস্থা হয়ে উঠেছিল যে ঐসব যাতায়াত আর তাঁর কোনো উপকারে আসবে না. বরং সম্পূর্ণ অন্য প্রয়োজন দেখা দিল। তবুও, সময়ের অভাব সত্ত্বেও হেয়ার ক. তাড়াহুড়া করে ঠিক সময়মত ওভারকোটটা নিয়ে এসেছিলেন, যদিও সেটা তখন আর তাঁর কোনো কাজে লাগবে না, আর সেটা করেছিলেন, তাঁর দেয়া কথাটা রাখবার জন্য।

সেই বেচারী ছেলে

হেয়ার ক. নিষ্ঠুর আচরণের কথা বলছিলেন। অন্যায়ের ফল সম্পূর্ণ নীরবে তেতরটায় জলে। তিনি এই কাহিনী বলেন—"সামনে দিয়ে একটা ছেলেকে কাঁদতে কাঁদতে যেতে দেখে একজন তাকে তার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করে। 'সিনেমায় যাব বলে আমি দুটো দশ ফেনী যোগাড় করেছিলাম', বলল সেই ছেলেটি, 'তখন একটা বড় ছেলে এসে জোর করে আমার হাত থেকে একটা কেড়ে নিয়েছে', এই বলে সে একটু দূরের একজনকে দেখাল, তাকে তখনো দেখা যাচ্ছে। 'তুই চিৎকার করিস নি ?' লোকটা জিজ্ঞাসা করল। 'করেছিলাম তো', বলে ছেলেটা আরো বেশী কোঁপাতে শুরু করল। 'কেউ শুনতে পায়নি তোর চিৎকার ?' লোকটা তাকে আরো জিজ্ঞাসা করল, সেই সঙ্গে আদর করে তার গায়ে হাত বোলাতে থাকল। কোঁপাতে কোঁপাতে ছেলেটা বলল, 'না।' 'তুই আরো জোর চিৎকার করতে পারিস না ?' লোকটা জানতে চাইল। 'তাহলে ওটাও দিয়ে দে।' ওর হাত থেকে শেষ দশ ফেনীটা নিয়ে নিশ্চিন্তে চলে গেল।"

প্রশ্ন, ঈশ্বর আছেন কিনা

হেয়ার ক.-কে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, ঈশ্বর আছেন কিনা। হেয়ার ক. বলেছিলেন, "একটা অনুরোধ করছি, ভেবে দেখ, এই প্রশ্নের উত্তর শুনলে তোমার ধারণার পরিবর্তন হবে কিনা। যদি পরিবর্তন না হয়, তাহলে আমরা এই প্রশ্ন উপেক্ষা করতে পারি। যদি পরিবর্তন হয়, তাহলে আমি তোমাকে অন্তত একটা কথা বলে সাহায্য করতে পারি, তুমি নিজেই ঠিক করে ফেলেছ—তোমার একটি ঈশ্বর দরকার।"

আলোচনা

"আমরা আর পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা বলতে পারছি না" হেয়ার ক. বললেন একজনকে। চমকে উঠে লোকটি জিজ্ঞাসা করল, "কেন?" "আপনার সামনে আমি তেমন ভাল কিছু বলতে পারি না", আফসোস করলেন হেয়ার ক.। "আরে তাতে আমার কিছুই যায় আসে না", সান্ত্বনা দিয়ে বললেন অন্যজন। —"তা জানি", বললেন হেয়ার ক. বিরক্ত ভাবে, "কিন্তু আমার যায় আসে।"

অতিথিপরায়ণতা

হেয়ার ক. আতিথ্য গ্রহণ করলে, সেই জায়গায় ঢোকবার সময় যেমন ছিল, তেমনি অবস্থায় তাকে রেখে আসেন; কারণ নিজের উপস্থিতির স্বাক্ষর সর্বত্র রেখে আসবার প্রবণতাকে তিনি প্রশ্রয় দেন না। বরং তিনি চেষ্টা করেন নিজের চাল-চলন সেই জায়গার সঙ্গে মানানসই করে তোলবার জন্য; অবশ্য সেজন্য তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে দেন না।

যখন হেয়ার ক. অতিথি আপ্যায়ন করেন তখন তিনি অন্তত একটা চেয়ার কিম্বা একটা টেবিল তার জায়গা থেকে সরিয়ে রাখেন। "তার কিসে সুবিধা হবে সেটা আমিই ঠিক করব, এবং সেটাই ভাল!" বলেন তিনি।

অচেনা বাড়ীতে হেয়ার ক.

একটা অচেনা বাড়ীতে ঢুকে বিশ্রাম করতে যাবার আগে হেয়ার ক. সেই বাড়ী থেকে বের হবার পথগুলো ছাড়া আর কিছুই দেখে নিলেন না। প্রশ্ন করতে অপ্রস্তুত ভাবে উত্তর দিলেন। "ওটা একটা পুরানো অভ্যাস। আমি ন্যায়ের

পথে ; কাজেই আমার থাকবার জায়গায় একটার বেশী বের হবার রাস্তা থাকা ভাল।"

আচরণের প্রকাশ মনোভাব

হেয়ার ক.-এর কাছে একজন দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক এসেছিলেন, তিনি হেয়ার ক-কে তাঁর জ্ঞানের কথা বলছিলেন। কিছুক্ষণ পরে হেয়ার ক. তাঁকে বললেন, "তুমি বসেছ অস্বস্তিতে, কথা বলছ অস্বস্তিতে, তুমি ভাবছ অস্বস্তিতে।" দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক বিরক্ত হয়ে বললেন, "আমি আমার ব্যাপারে কিছু জানতে চাইনি, আমি যা বলছি, সেই বক্তব্য ব্যাপারে জানতে চেয়েছি।" "বক্তব্য বলে কিছু নেই", বললেন হেয়ার ক.। "দেখছি তুমি হাতড়ে হাতড়ে চলেছ, গন্তব্যস্থল বলে কিছু নেই, তোমার চলা দেখে বুঝছি ; তাই তুমি পৌঁছুবে না। তোমার কথাবার্তা অস্পষ্ট, আর সেই কথাবার্তায় কিছুই স্পষ্ট হয় না। তোমার ধরণ দেখে তোমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমার কোনো উৎসাহ জাগে না।"

হেয়ার ক. যদি একজন মানুষকে ভালবাসতেন

হেয়ার ক.-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "একজন মানুষকে ভালবাসলে আপনি কী করেন ?" "তার সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিই", বলেছিলেন হেয়ার ক., "তারপর চেষ্টা করি যেন একরকম হয়।" "কী ? ধারণাটা ?" "না. মানুষটা", বলেছিলেন হেয়ার ক.।

হেয়ার ক. এবং যুক্তিজ্ঞান

একদিন হেয়ার ক. তাঁর বন্ধুদের মধ্যে একজনকে এই কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"কদিন আগে থেকে একজনের সঙ্গে মেলামেশা করছি, লোকটি আমার বাড়ির উল্টো দিকে থাকে। এখন তার সঙ্গে মেলামেশা করার কোনো ইচ্ছা আর আমার নেই ; যাই হোক, শুধু তার সঙ্গে মেলামেশা করার একটা কারণও খুঁজে পাচ্ছি না, তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেবারও না। এবার আমি জানতে পেরেছি যে সেই ছোট্ট বাড়িটা, যেটা সে এতদিন ভাড়া করে ছিল, সেটা কিনে নিয়েই জানালার সামনের ফুলগাছটা কাটিয়ে ফেলেছে। কারণ ওটার জন্য জানালা দিয়ে আলো ঢুকতে পারত না, যদিও ফলগুলো

সবে আধপাকা হয়ে উঠেছিল। এঁকে কি তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেবার কারণ বলে মনে করতে পারি, অন্ততপক্ষে ওপর ওপর কিম্বা ভেতরে ভেতরে?" এর কদিন পরে হেয়ার ক. তাঁর বন্ধুকে বললেন, "আমি এবার লোকটার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছি; ভেবে দেখুন একবার, বেশ কয়েক মাস ধরে তার সেই আগের বাড়িওয়ালা চেষ্টা করছিল ঐ গাছটা কেটে ফেলতে। কেননা ওটার জন্য জানালা দিয়ে আলো ঢুকতে পারত না। সে কিন্তু তা হতে দেয়নি, কারণ সে সেই ফলগুলোর আশায় ছিল। আর এখন, যেমনি বাড়িটা আবার এই লোকটার হাতে এল, অমনি সে সেই গাছটা সত্যিসত্যিই কাটিয়ে ফেলল, গাছ ভরতি আধপাকা ফল! তার এই যুক্তি-বিরোধী আচরণের জন্য আমি তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছি।"

ভাবনার পিতৃত্ব

হেয়ার ক.-কে অনুযোগ করা হয়, তাঁর কাছে নাকি ইচ্ছা অত্যন্ত বেশীর ভাগ সময়েই ভাবনার উৎস। হেয়ার ক. উত্তর করেন, "এমন ভাবনা কখনই আসেনি যার মূলে কোনো ইচ্ছা ছিল না। কোন ইচ্ছা—একমাত্র সেই বিষয়ে তর্ক উঠতে পারে। পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা কঠিন বলে সংশয় প্রকাশ করবার জন্য সংশয় প্রকাশ করা যেতে পারে না যে একটি শিশুর আদৌ কোনো পিতা থাকতে পারে।"

মৌলিকতা

হেয়ার ক. টিপ্পনী করেন, আজকাল অনেক সময় দেখা যায়, লোকেরা সাধারণ্যে বড়াই করে বেড়ায়, সম্পূর্ণ একাকী বিশাল বিশাল বই লিখে ফেলতে পারে; আর, সকলে তা মেনেও নেয়। চীন দেশের দার্শনিক জুয়াং দসি পরিণত বয়সে এক লক্ষ শব্দের এক বই লেখেন, তার দশভাগের নয় ভাগই ছিল উদ্ধৃতি। আমাদের এখানে আর এজাতীয় বই লেখা হয় না, মেধার অভাব। তার ফলে ভাবনা-চিন্তা কেবলমাত্র নিজের কারখানাতেই তৈরী হয়, ফলে যে তার থেকে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাতে না পারে তাকে খারাপ মনে হয়। কাজেই তখন আর এমন ভাবনা থাকে না যা গ্রহণ করা যায়, কোনো ভাবনাকে বিন্যস্তও করা যায় না, যা উদ্ধৃত করা যায়। এদের কাজের জন্য কত সামান্য প্রয়োজন! একটা কলম আর কিছু কাগজ তাদের একমাত্র সম্বল! আর, কোনো রকম সাহায্য ছাড়াই, শুধু ঐ সামান্য সম্পদ, যা একজন মাত্র লোক হাতে বয়ে

নিতে পারে, তাই দিয়ে তারা তাদের তুঁতেখর বানায়! বড় বড় প্রাসাদ তারা চেনে না, কলে কাবে না, ওসব একা একজন বানাতে পারে।

প্রতিষ্ঠা

একজন অভিনেত্রীকে পাশ দিয়ে যেতে দেখে হেয়ার ক. বলেছিলেন, "দেখতে সুন্দর।" তাঁর সঙ্গী তখন বলে, "দেখতে সুন্দর বলে মহিলাটি ইদানীং প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।" হেয়ার ক. বিরক্ত হয়ে বলেন, "মেয়েটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বলে সুন্দর।"

"যখনকারটা তখন"-এর ব্যাঘাত প্রসঙ্গে

একবার বলতে গেলে অপরিচিত লোকের বাড়িতে অতিথি অবস্থায় হেয়ার ক. লক্ষ্য করেন যে তাঁর আশ্রয়দাতারা শোবার ঘরের বিছানা থেকে দেখা যায় এমন এক কোণের একটা ছোট্ট টেবিলের ওপর সকালের খাবারের বাসন-পত্র সাজিয়ে রেখেছে। তাঁর জন্য সমস্ত ব্যবস্থা শেষ করে রাখতে তাঁর আশ্রয়দাতারা ব্যস্ত হয়েছিল মনে করে প্রথমে মনে মনে প্রশংসা করে তিনি ভাবতে শুরু করলেন, তিনি নিজেও রাতে শুতে যাবার আগে সকালের খাবারের বাসন-পত্র গুছিয়ে রাখতেন কিনা। বেশ কিছু ভাবনা চিন্তা করে ঠিক করলেন, সঠিক সময়ে কাজ করাই ঠিক। তেমনি ঠিক মনে হল তাঁর, যে অন্য লোকেও কখনো কখনো এই সমস্যা নিয়ে কিছুক্ষণ ব্যস্ত থাকে।

হেয়ার ক. এবং বেড়ালগুলো

হেয়ার ক. বেড়াল ভালবাসতেন না। তাঁর কাছে ওগুলো মানুষের বন্ধু বলে মনে হতো না, তাই তিনিও ওদের বন্ধু নন। "আমাদের যদি একই উদ্দেশ্য থাকত", তিনি বলতেন, "তাহলে ওদের বিরোধী আচরণে আমার কিছু যেত আসত না।" আবার একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই তিনি তাঁর চেয়ারের ওপর থেকে বেড়াল তাড়াতেন। "বিশ্রাম করাও একটা কাজ", বলেন তিনি; "ওটা সফল হোক।" এমন কি যখন বেড়ালগুলো তাঁর দরজার সামনে চেঁচামেচি করত, তখন শীতের মধ্যেও উঠে গিয়ে দরজা খুলে ওগুলোকে গরম ঘরে ঢুকতে দিতেন। "ওদের হিসেব সোজা", তিনি বলেন, "ডাকলে দরজা খুলে দেয়। দরজা খুলে না দিলে ওরা আর ডাকে না। ডাকা উন্নতির প্রতীক।"

হেয়ার ক.-এর প্রিয় জন্তু

কোন জন্তুকে তিনি সবচেয়ে বেশী মূল্য দেন জিজ্ঞাসা করাতে, হেয়ার ক. হাতির নাম করেন এবং তার কারণ হিসেবে বলেন : হাতি বুদ্ধির সঙ্গে শক্তির মিলন ঘটায়। কাউকে জানতে না দিয়ে উৎপীড়ন এড়িয়ে যাবার বা খাদ্য সংগ্রহ করবার নীচ বুদ্ধি নয়, সেই বুদ্ধি, যার সাহায্যে বড় কাজের জন্য শক্তির ব্যবহার হয়। এই জন্তুর অবস্থান ক্ষেত্রে প্রশস্ত চিহ্ন থাকে। তাছাড়া এরা ভাল প্রকৃতির এবং তামাশা বোঝে। এরা বন্ধু হিসেবে ভাল, শত্রু হিসেবেও। বিশাল আকৃতির এবং ভারী তবুও বেশ দ্রুতগতি। ওদের শুঁড় দিয়ে ক্ষুদ্রতম খাদ্যও এক বিশাল চেহারাকে যোগায়, বাদাম অবধি। ওদের কান নিয়ন্ত্রিত করা যায় : একমাত্র পছন্দসই হলে শোনে। এরা বাঁচেও বহুকাল। এরা মিশুকও এবং তা কেবলমাত্র হাতিদের সঙ্গেই নয়। সর্বত্র ভালবাসা পায় আবার সবাই এদের ভয়ও পায়। এক বিশেষ কৌতুক মজায় তো এমন করা হয়েছে যে এরা সম্মানিত হতে পারে। এদের চামড়া মোটা, সেখানে ছুরি ভেঙে যায় ; তবে এদের প্রকৃতি নরম। এরা দুঃখিত হতে পারে। এরা ক্রুদ্ধ হতে পারে। নাচতে ভালবাসে, মারা যায় জঙ্গলে। এরা শিশুদের এবং অন্য ছোট জন্তুদের ভালবাসে। এদের রঙ ধূসর এবং শুধু বিশাল আকৃতির জন্য নজরে পড়ে। এদের খাওয়া যায় না। খুব কাজের। সুরা পান করতে ভালবাসে এবং খুশী হয়। শিল্পের জন্য এরা কিছু করে— হাতির দাঁত সরবরাহ করে।

প্রাচীনতা

শিল্পী লুওস্ট্রোম-এর আঁকা কিছু জলের পাত্রের এক ছবির সামনে দাঁড়িয়ে হেয়ার ক. বলেছিলেন, "প্রাচীনকালের এক ছবি, বর্বর যুগের ছবি ! সে সময়ে মানুষে বোধহয় কিছুরই তফাৎ বুঝতো না, গোলটা গোল মনে হতো না, ছুঁচোলোটা ছুঁচোলো নয়। শিল্পীদের এটা আবার ঠিক করতে হবে এবং খরিদ্দারকে সঠিক, স্পষ্ট, প্রকৃত আকৃতির কিছু দেখাতে হবে ; তারা এত অস্পষ্ট, ভাসা-ভাসা, সন্দেহজনক বস্তু দেখেছে ; তারা নিষ্কলুষতার জন্য এমন তৃষ্ণার্ত ছিল, যে যদি কেউ তার পাগলামি মেনে নিতে না দিত তাহলে তারা তাকে কবেই অভিনন্দিত করত। এই ছবি দেখলেই বোঝা যায়, কাজটা অনেকের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়েছিল। যারা আকৃতি ঠিক করে দিয়েছে তারা বস্তুটির

উদারবোধিতা সম্বন্ধে ভাবেনি ; এই পাত্রটা থেকে জল ঢালা অসম্ভব। সে সময়ে কিন্তু প্রচুর মানুষ ছিল, যাদের প্রয়োজনীয় বস্তু ছাড়া মনে করা হত। সেই ব্যাপারেও শিল্পীদের বিরোধিতা করতে হতো। এক বর্বর যুগ, প্রাচীনতা !" হেয়ার ক.-কে খেয়াল করিয়ে দেয়া হয়েছিল, যে ছবিটা বর্তমান কালে আঁকা।
"হ্যা", দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন হেয়ার ক., "প্রাচীন কালের।"

বিচার-ব্যবস্থা

প্রাচীন চীন দেশের একটি কানুনকে হেয়ার ক প্রায়ই বিশেষ ভাবে আদর্শ বলে বলতেন। সেই কানুন অনুসারে বড় বড় মামলার জন্য বিচারকদের আনা হতো বহুদূরের দেশ থেকে। ফলে তাদের ওপর ঘুষ দিয়ে প্রভাব বিস্তার করা অনেক বেশী কঠিন হতো (এবং সেইজন্য ঘুষের সাহায্যে কম প্রভাবিত হতো), কারণ স্থানীয় বিচারকরা সেদিকে নজর রাখত। অর্থাৎ সেইসব লোক নজর রাখত, যারা বিশেষ করে এই ব্যাপারের সব উপায় জানত এবং বহিরাগতদের ক্ষতি করবার চেষ্টা করত। তাছাড়া এইসব আমদানী করা বিচারকরা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে স্থানীয় বিধি ব্যবহার ব্যাপারগুলি জানতো না। শ্রেফ প্রতিনিয়ত ঘটনার মাধ্যমে অন্যায় প্রায়ই তাদের চরিত্র কলুষিত করে। নতুনেরা সব নতুন করে বিবৃত করতে বাধ্য করত ; যার ফলে তারা লক্ষণীয় বিষয়গুলি বেছে নিত। শেষকালে তারা নিরপেক্ষ নীতির কারণে কৃতজ্ঞতা, শিশুর প্রতি মমতা, অতি পরিচিত ব্যক্তির নির্দোষিতা ইত্যাদি ক্ষুণ্ণ করতে বাধ্য হতো না কিম্বা এতটা সাহস পেত, যে সেই পরিবেশে শত্রু বৃদ্ধি করতে পারত।

একটি সুন্দর উত্তর

একজন অতি দরিদ্রকে আদালতে জিজ্ঞাসা করা হয়, সে প্রচলিত শপথ গ্রহণ করবে, না গীর্জার শপথ। সে উত্তর করেছিল, "আমি বেকার।" "এটা অনুবোধ অন্যমনস্কতা নয়", বলেছিলেন হেয়ার ক.। "এই উত্তরের মাধ্যমে সে জানিয়ে দিয়েছিল, যে সে এমন একটা অবস্থায় আছে, যেখানে এইসব এবং এমনকি হয়তো সম্পূর্ণ বিচার ব্যবস্থাই অর্থহীন।"

দর্শনের ইতিহাসের ওপর লেখা একটা বই পড়বার পর হেয়ার ক. দার্শনিকদের প্রচেষ্টাকে সমালোচনা করে বলেছিলেন সর্বকিছু দুর্জ্ঞেয় অপরিচিত করে তোলবার জন্য। "কোনো রকম পড়াশুনা না করেই সফিস্টদের ধারণা হয়েছিল, তারা অনেক কিছু জানে", তিনি বলেছিলেন, "তখন সফিষ্ট সক্রেটিস এগিয়ে এলেন তাঁর উদ্ধত উক্তি নিয়ে। তিনি জানেন যে তিনি কিছুই জানেন না। আশা করা যেত তিনি তাঁর কথা শেষ করবেন: কারণ আমিও কোনোরকম পড়াশুনা করিনি। (কিছু জানতে হলে আমাদের পড়াশুনা করতে হবে।) কিন্তু মনে হচ্ছে তিনি আর কিছু বলেননি, আর হয়তো তাঁর প্রথম কথার পরে প্রচণ্ড হাততালি ফেটে পড়ে দুহাজার বছর ধরে চলেছিল, ফলে পরবর্তী প্রত্যেক কথাকে চাপা পড়েছিল।"

রাষ্ট্রদূত

একজন বিদেশী রাষ্ট্রদূত, হেয়ার এক্স প্রসঙ্গে কদিন আগে হেয়ার ক.-এর সঙ্গে কথা বলছিলাম। লোকটি আমাদের দেশে তার দেশের বিশেষ আদেশ অনুসারে কাজ করেছিল এবং তার দেশে ফেরবার পর, আমরা দুঃখের সঙ্গে জানতে পারলাম, তার বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল, যদিও সে তার কাজ বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে শেষ করে ফিরেছিল। "তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, যে তার প্রতি আদেশ প্রতিপালন করতে গিয়ে আমাদের সঙ্গে, শত্রুপক্ষের সঙ্গে বড় বেশী মিশেছিল", আমি বলেছিলাম। "আপনার কি ধারণা, সেই রকম আচরণ না করলে সে সফল হতে পারত?"—"অবশ্যই পারত না", বলেছিলেন হেয়ার ক., "তাকে ভাল খাওয়া দাওয়া করতে হয়েছে যাতে সে তার শত্রুদের সঙ্গে একটা রফায় আসতে পারে, তাকে দুষ্কৃতকারীদের প্রশ্রয় দিতে হয়েছে, নিজের দেশকে নিয়ে তামাশা করতে হয়েছে যাতে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।"—"তাহলে তো সে ঠিকই করেছিল?" আমি প্রশ্ন করেছিলাম। "হ্যাঁ, নিশ্চয়", বলেছিলেন হেয়ার ক. অন্যমনস্ক ভাবে। "সে ঠিকই করেছিল।" এই বলে হেয়ার ক. চলে যাচ্ছিলেন। আমি যাহোক তাঁর হাত ধরে ফিরিয়ে এনেছিলাম। "তাহলে তাকে দেশে ফেরবার পর এরকম দুর্দশায় ফেলা হল কেন?" আমি আহত স্বরে চিৎকার করে উঠেছিলাম। "তার বোধহয় ভাল খাওয়া-দাওয়ার অভ্যেস হয়ে গেছিল, দুষ্কৃতকারীদের সঙ্গে মেলামেশা

চালিয়ে গেছিল আর তার বিচার সন্দেহজনক হয়ে পড়েছিল", হেয়ার ক. বলেছিলেন নিরাসক্ত ভাবে, "আর তাই ওদের ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল।" "আর সেটা আপনার মতে ওরা ঠিকই করেছিল?" প্রশ্ন করেছিলাম হতাশভাবে।—'হ্যাঁ, নিশ্চয়, নইলে আর কী করতে পারত ওরা?" হেয়ার ক. বলেছিলেন। "মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনেও একটা কাজ নেবার সাহস তার ছিল, এবং তার ফলও। কাজেই সে মরেছে। ওরা তখন তাকে কবর না দিয়ে আর কী করতে পারত? তাকে হাওয়ায় ঝুলিয়ে রেখে পচতে দিত আর সেই দুর্গন্ধ সহ্য করত?"

স্বাভাবিক সম্পত্তির আগ্রহ

আলোচনা প্রসঙ্গে যখন একজন সম্পত্তির প্রতি আগ্রহ স্বাভাবিক বলে উল্লেখ করে তখন হেয়ার ক. প্রাচীন উপজাতীয় জেলেদের এই কাহিনী শোনান। আইসল্যাণ্ডের দক্ষিণ উপকূলে কিছু জেলে আছে, তারা সেখানকার উপসাগর শক্ত করে নোঙর-দেয়া বয়া দিয়ে ভাগ করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। এইসব জল-জমির প্রতি তাদের আকর্ষণ নিজেদের সম্পত্তির চেয়ে বেশী। তারা নিজেদের ওরই একটা অংশ বলে মনে করে। যখন ওগুলোর মধ্যে আব মাছ পাওয়া যায় না, তখনও ওরা হাল ছাড়ে না আর বন্দরের যেসব লোকের কাছে তারা তাদের মাছ বিক্রি করে তাদের শাপ-শাপান্তি করে, কারণ তারা ওদের কাছে ভেসে আসা সৃষ্টিছাড়া এক জাত বলে মনে হয়। তারা নিজেদের জলের মানুষ বলে জানে। যখন তারা বড় কোনো মাছ ধরে তখন সেটা তারা জালার মধ্যে রেখে দেয়, তার নাম দেয় আর সেটাকে নিজেদের সম্পত্তির চেয়ে বেশী ভালবাসে। কিছুকাল যাবৎ ওদের আর্থিক অবস্থার নাকি অবনতি হয়েছে, তবুও তারা যাবতীয় উন্নতির প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করছে, তার ফলে বেশ কয়েকটি সরকারকে তারা ভেঙে দিয়েছে, যেগুলো তাদের আচার-ব্যবহারকে অবহেলা করেছিল। এইসব জেলেরা অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করেছে সম্পত্তির আগ্রহের শক্তি। এটা মনুষ্য-জাতির প্রকৃতিদত্ত এক বৈশিষ্ট্য।

হাঙরেরা যদি মানুষ হতো

"হাঙরেরা যদি মানুষ হতো", বাচ্চা মেয়েটা প্রশ্ন করেছিল তাদের ভাড়াটে হেয়ার ক.-কে, "তাহলে কি তারা ছোট ছোট মাছদের সাথে আরো ভাল

ব্যবহার করত?" "নিশ্চয়", তিনি বলেছিলেন। "হাঙররা যদি মানুষ হতো তাহলে তারা সমুদ্রের ছোট ছোট মাছগুলোর জন্য মজবুত সব খাঁচা বানাতো—আর সেসব খাঁচায় আমিষ, নিরামিষ সব রকম খাদ্যের ব্যবস্থাই থাকতো। খাঁচাগুলোর মধ্যে জল যাতে সব সময়ে টাট্‌কা থাকে আর অন্য সব ব্যবস্থা যাতে পুরোপুরি স্বাস্থ্যসম্মত হয় সেদিকেও তারা নজর রাখতো। কোনো মাছের পাখনা একটু আধটু ছড়ে গেলে তক্ষুণি সেখানে ভাল করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেয়া হতো, যাতে সে কোনোক্রমেই হাঙরদের এড়িয়ে আগে-ভাগে মরে না যায়। তাছাড়া মাছগুলো যাতে মন-মরা হয়ে না থাকে তার জন্যও মাঝে মধ্যে জলের তলে ঘটা করে উৎসব করা হতো। কারণ, আনন্দ উচ্ছল মাছ মুষড়ে পড়া মাছের চেয়ে খেতে ভাল। সেই সব বড় বড় খাঁচার মধ্যে অবশ্যই পাঠশালাও থাকতো। এই সব পাঠশালায় কচি কচি মাছেদের শেখানো হতো কিভাবে সাঁতার কেটে হাঙরদের গহ্বরে ঢুকতে হয়। সেখানে তাদের অতি অবশ্য ভূগোলও পড়ানো হতো। বড় কোনো হাঙর হয়তো আলসেমি করে কোথাও একটা শুয়ে আছে, তাকে খুঁজে বার করতে হবে তো। তবে কচি কচি মাছেদের মনের উন্নতির দিকেই সবচেয়ে বেশী নজর দেয়া হতো আর বোঝানো হতো, একটা মাছের পক্ষে সানন্দে আত্মোৎসর্গ করার চেয়ে মহৎ এবং গৌরবপূর্ণ কাজ আর কিছুই নেই। মাছেদের পক্ষেও অবশ্য হাঙরদের সব কথা বিশ্বাস করাটাই বাঞ্ছনীয় হতো, বিশেষ করে যখন হাঙররা ছোট ছোট মাছদের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশ্বাস দিত। সুবোধ-সুশীল ভাবে এসব মানলেই সেই ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কার হবে, মাছেদের মনে এই বিশ্বাসও জাগানো হতো। যাবতীয় হীন, বাস্তব, আত্মসচেতন এবং মার্কসীয় ভাবনা থেকে দূরে থাকাই যে মাছদের পক্ষে হিতকর, এ কথাও তাদের বোঝানো হতো। তাদের মধ্যে কারো কখনো ঐরকম কোনো মনোবৃত্তির আভাস প্রকাশ পেলেই সেকথা হাঙরদের কানে পৌঁছে দেওয়াটা তাদের কর্তব্য হতো। যদি হাঙররা মানুষ হতো, তাহলে তারা স্বভাবতই পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করত, বিদেশী মাছের বসতি আর বিদেশী মাছ জয় করে আনবার জন্য। সেইসব যুদ্ধ করতে হাঙররা অবশ্যই মাছেদের পাঠাতো। তারা মাছেদের স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিত যে ঐসব বিদেশী মাছেদের সঙ্গে তাদের কেমন আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সবাই জানে মাছেরা নির্বাক। কিন্তু তাদের বুঝিয়ে দেয়া হতো যে দু-দল মাছ সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষায় নির্বাক, ফলে পরস্পরের

বক্তব্য তাদের পক্ষে বুঝে ওঠা অসম্ভব। এইসব যুদ্ধে কোনো মাছ শত্রুপক্ষের কিছু ভিন্ন ভাষায় নির্বাক মাছ মারতে পারলে তাকে সামুদ্রিক উদ্ভিদ দিয়ে তৈরী পদক দিয়ে সম্মানিত করা হতো আর বীর আখ্যা দেয়া হতো। হাঙরেরা যদি মানুষ হতো তাহলে স্বভাবতই তাদের একটা শিল্প চেতনা থাকতো। সুন্দর সুন্দর সব ছবি থাকতো—সেসব ছবিতে হাঙরদের দাঁতগুলো সব চমৎকার রঙে আঁকা থাকতো, আর তাদের মুখ-গহ্বর আঁকা হতো, যেন মনোরম খগোদ্যান—সেখানে মনের সুখে হাত-পা ছড়িয়ে আনন্দ করা যায়। সমুদ্র-তলের সেই রঙ্গমঞ্চের নাটকে দেখানো হতো সাহসী, বীর মাছেরা কেমন আনন্দ উজ্জ্বল অবস্থায় হাঙরদের মুখ-গহ্বরে গিয়ে ঢুকছে। সেই সঙ্গে বাজনা এমনই মন মাতানো হতো যে সব মূর্ছনার প্রভাবে মাছেরা বাদ্যকারদের আগে আগে, বিভোর অবস্থায়, চরম আনন্দে হাঙরদের মুখ-গহ্বরের দিকে ছুটতো। হাঙরেরা মানুষ হলে তাদের মধ্যে একটা ধর্মও থাকতো। সেই ধর্মের পাঠে বলা হতো যে মৎস্যজীবনের সার্থকতা প্রকৃতপক্ষে হাঙরেরই ঘটবে। হাঙররা মানুষ হলে কিন্তু মাছেদের জগতে এখন যেমন আছে, অর্থাৎ সব মাছই সমান, তেমন আর থাকতো না। তাদের মধ্যে কিছু মাছ পদমর্যাদা পেত, আর তাদের অধীনে থাকতো অন্য মাছেরা। এইসব মাছেদের মধ্যে যারা একটু আধটু বড়, তারা ছোটদের খেয়ে ফেলবার অধিকারও পেত। এতে হাঙরদের বেশ সুবিধাই হতো, কারণ তাহলে তারা আরো বেশী বড় মাছ খেতে পেত। আর, এইসব ওপরতলার মাছেরা—অর্থাৎ শিক্ষক, অফিসার, খাঁচা বানাবার ইঞ্জিনীয়ার, প্রমুখেরা অন্যান্য মাছেদের মধ্যে শৃঙ্খলার ব্যবস্থার দিকে নজর রাখতো। এক কথায়, হাঙররা যদি মানুষ হতো, তাহলেই সমুদ্রের তলে সর্বত্র সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতো।"

(অনুবাদ : আরুণি সেন)

প্রশংসা

হেয়ার ক. যখন শুনলেন, পুরানো ছাত্ররা তাঁর প্রশংসা করছে, তখন তিনি বলেছিলেন, "ছাত্ররা মাস্টার মশাই-এর দোষগুলো অনেক কাল আগে ভুলে যাবার পর তিনি নিজে সেগুলোর কথা ভাবেন।"

অপেক্ষা

কিছু একটার জন্য হেয়ার ক. একটা দিন অপেক্ষা করেছিলেন, তারপর একটা সপ্তাহ, তারপর আরো একটা মাস। অবশেষে তিনি বলেছিলেন, "একটা মাস আমি অনায়াসে অপেক্ষা করতে পারতাম, কিন্তু এই দিনটা বা সপ্তাহটা নয়।"

উদ্দেশ্য সাধক

হেয়ার ক. এই প্রশ্নগুলো করেছিল:

"প্রত্যেক দিন সকালে আমার প্রতিবেশী গ্রামোফোন বাজে বাজনা বাজায়। কেন বাজনা বাজায়? শুনি, সে ব্যায়াম করে বলে। কেন ব্যায়াম করে? কারণ তার শক্তি দরকার, শুনতে পাই। কি জন্য তার শক্তি দরকার? কারণ তাকে শহরে তার যত শত্রু আছে তাদের হারিয়ে দিতে হবে, সে বলে। শত্রুদের কেন হারাতে হবে? কারণ সে খেতে চায়, শুনি।"

হেয়ার ক যখন শুনলেন, তাঁর প্রতিবেশী বাজনা বাজায় ব্যায়াম করবার জন্য, ব্যায়াম করে শক্তিশালী হবার জন্য, শক্তিশালী হতে চায় শত্রুদের নিপাত করবার জন্য, নিপাত করতে চায় খাবার জন্য, তখন তিনি তাঁর প্রশ্ন করেছিলেন, "সে খায় কেন?"

অন্যায় ভাবে প্রভাবিত না হওয়ার চাতুর্য

হেয়ার ক. একজন ব্যবসায়ীর কাছে একজনের সুপারিশ করেছিলেন তার অন্যায় ভাবে প্রভাবিত না-হওয়া চরিত্রের জন্য। দু সপ্তাহ পরে সেই ব্যবসায়ী আবার হেয়ার ক-এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেছিল, "অন্যায় ভাবে প্রভাবিত না-হওয়া চরিত্র বলতে তুমি কী বুঝেছ?" হেয়ার ক. বলেছিলেন, "আমি যদি বলি, যে লোকটাকে তুমি চাকরি দেবে, সে অন্যায় ভাবে প্রভাবিত হয় না, তার অর্থ আমি বলতে চাই, তুমি ওর ওপর অন্যায় প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।" "তাই", ব্যবসায়ীটি বলেছিল আহত স্বরে, "এখন আমার আশঙ্কা করবার কারণ আছে যে তোমার লোকটি আমার শত্রুদের দ্বারাও প্রভাবিত হয়." "তা আমি জানি না", বলেছিলেন হেয়ার ক. নিরাসক্ত ভাবে। "আমার কিন্তু", চেঁচিয়ে উঠেছিল সেই ব্যবসায়ী তিক্ত

ভাবে, "সব সময়ে মন ঘুমিয়ে চলে, অর্থাৎ আমার দ্বারাও সে প্রভাবিত হয়।" হেয়ার ক. অলসভাবে মুচকি হেসেছিলেন। "আমার দ্বারা সে প্রভাবিত হয় না", তিনি বলেছিলেন।

দেশপ্রেম, দেশবাসীর প্রতি ঘৃণা

কোনো এক বিশেষ দেশে বাস করা হেয়ার ক প্রয়োজনীয় মনে করতেন না। তিনি বলতেন, "সর্বত্রই আমি অভুক্ত থাকতে পারি।" কিন্তু একদিন তিনি একটা শহরের পথ ধরে যাচ্ছিলেন, সেই শহর তখন সেদেশের শত্রুদের অধীনে, অর্থাৎ যে দেশে তিনি বাস করতেন। তখন শত্রুদের একজন অফিসার তাঁর মুখোমুখি এগিয়ে আসে এবং তাঁকে পথ ছেড়ে নেমে যেতে বাধ্য করে। হেয়ার ক. পথ ছেড়ে নেমে গিয়ে বুঝতে পারলেন, সেই লোকটির ব্যবহারে তিনি আহত, এবং শুধু সেই লোকটির প্রতিই বিরক্ত নন, বিশেষ করে সেই দেশের প্রতি যে দেশের লোক সেই অফিসারটি, ফলে তিনি প্রার্থনা করছিলেন, যেন সেই দেশ ভূপৃষ্ঠ থেকে ধ্বংস হয়ে যায়। "কেমন করে", হেয়ার ক. প্রশ্ন করেছিলেন, "আমি সেই সময়টুকুর জন্য ন্যাশনালিষ্ট হয়ে পড়েছিলাম? একজন ন্যাশনালিষ্ট-এর সংস্পর্শে এসে। কিন্তু সেইজন্য বোকামিকে অবশ্যই উৎখাত করতে হবে, কারণ তার সংস্পর্শে এলে লোকে বোকা হয়।"

অভুক্ত থাকা

দেশ প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে হেয়ার ক. বলেছিলেন, "সবত্রই আমি অভুক্ত থাকতে পারি।" একজন মনযোগী শ্রোতা এবার তাঁকে প্রশ্ন করে, এমন কথা আসে কোথা থেকে যে তিনি বলেন, তিনি অভুক্ত থাকেন, যদিও প্রকৃতপক্ষে তাঁর খাদ্য আছে। সেই অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে হেয়ার ক. বলেন, "খুব সম্ভব আমি বলতে চেয়েছিলাম, বাস করতে চাইলে আমি সর্বত্র বাস করতে পারি, যেখানে খাদ্যাভাব চলছে। আমি স্বীকার করছি যে আমি নিজে অভুক্ত আছি এবং এমন দেশে বাস করছি যেখানে খাদ্যাভাব চলছে, এই দুই বক্তব্যের মধ্যে তফাৎ অনেক। কিন্তু যুক্তি হিসেবে আমি বোধহয় বলতে পারি, আমার কাছে যেখানে খাদ্যাভাব চলছে সেখানে বাস করা যদিও অভুক্ত থাকার মত খারাপ নয়, তবে অন্ততপক্ষে অবশ্যই খুব

খারাপ। অন্যের কাছে আমার অতুক্ত থাকাটা তেমন বিশেষ কিছু না হতে পারে, কিন্তু একথা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে আমি খাদ্যাভাব চলার বিরুদ্ধে।"

প্রস্তাব না মানলে প্রস্তাব

হেয়ার ক. পরামর্শ দিয়েছিলেন, সম্ভব হলেই প্রতিটি প্রস্তাবের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আরও একটি প্রস্তাব রাখা, যদি প্রথম প্রস্তাব না মানা হয় সেইজন্য। তিনি যেমন একজনকে—লোকটা দুরবস্থায় পড়েছিল—একটা বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, যেটা অন্যদের যথাসম্ভব কম ক্ষতির কারণ হতে পারত, তবে তাকে আরও একটি পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন, কম ক্ষতিকারক তবে সম্পূর্ণ রকম বেপরোয়া নয়। "যে সব পারে না", তিনি বলেছিলেন, "তার বেলায় সামান্য কিছুও বাদ রাখতে নেই।"

অপরিহার্য অফিসার

একজন অফিসার বেশ কিছুকাল যাবত তাঁর দপ্তরের কাজ চালাচ্ছিলেন। হেয়ার ক. তাঁর খুব প্রশংসা শুনেছিলেন, তিনি এত ভাল অফিসার যে তিনি অফিসের কাজে অপরিহার্য। "তিনি অপরিহার্য কেন?" প্রশ্ন করেছিলেন হেয়ার ক. বিরক্তভাবে। "ওঁকে ছাড়া অফিসের কাজ অচল হয়ে পড়বে", বলেছিল তাঁর প্রশংসাকারী। "তাহলে আর তিনি কেমন ভাল অফিসার, যদি তাঁকে ছাড়া অফিসই অচল হয়ে পড়ে?" বলেছিলেন হেয়ার ক., "তাঁর অফিসের কাজকর্ম গোছাবার মত যথেষ্ট সময় পেয়েছিলেন, যাতে তাঁর অনুপস্থিতিতেও অফিস চলতে পারে। কী কাজটা করেন তিনি আসলে? আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি, কাজ করেন ভয় দেখানোর!"

সন্তোষজনক প্রশ্ন

"আমি লক্ষ্য করেছি", বলছিলেন হেয়ার ক., "আমরা অনেকেই আমাদের শিক্ষার ব্যাপারে তেমন উৎসাহ পাই না, কারণ আমরা সব প্রশ্নেরই একটা করে উত্তর জানি। প্রচারের সুবিধার জন্য যেসব প্রশ্নের মীমাংসা হয়নি বলে মনে হয়, আমরা তার একটা লিস্ট তৈরী করতে পারি না?"

শ্রেষ্ঠের অসুবিধা

"কী কাজ করছেন?" কেয়ার ক.-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। কেয়ার ক. উত্তর দিয়েছিলেন, "বেশ অসুবিধায় পড়েছি, পরবর্তী ভুলের প্রস্তুতি চালাচ্ছি।"

সহনীয় অপমান

কেয়ার ক.-এর এক সহকর্মী সম্বন্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল, সে তাঁর সম্বন্ধে অসদাচরণকে প্রশ্রয় দেয়। "হ্যাঁ, তবে একমাত্র আমার পেছনে", এই বলে কেয়ার ক তার বিরুদ্ধের অভিযোগ খণ্ডন করেছিলেন।

দুই শহর

কেয়ার ক. এ-শহরের বদলে বি-শহর বেছে নিয়েছিলেন। "এ-শহরে", তিনি বলেছিলেন, "লোকে আমাকে ভালবাসে, কিন্তু বি-শহরে লোকে আমার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। এ-শহরে আমাকে কাজে লাগানো হতো, কিন্তু বি-শহরে আমাকে দরকার। এ-শহরে আমাকে খাবার টেবিলে ডাকা হতো, কিন্তু বি-শহরে আমাকে হেঁসেলে নিয়ে যাওয়া হতো।"

পুনর্মিলন

একজন হেয়ার ক-এর সাথে বহুকাল পরে দেখা হলে এই বলে অভিবাদন জানায়: "আপনার আদৌ কোনো পরিবর্তন হয়নি।" "ও!" বলে কেয়ার ক. বিবর্ণ হয়ে গেছিলেন।